বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়



শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
অরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ পঁচিশে বৈশাখ ১৩৬৭

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক :
ধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ মাস্টারমশাই
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শ্রীচরণে
সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে
শ্রদ্ধার্ঘ্য

স্নেহধন্য
রবি

ভূমিকা

বিজ্ঞান জগতে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অতুলনীয় অবদান ভারতবর্ষকে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। বিজ্ঞানবিদ্ ও গণিতজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র— এ কথা যেমন সত্য, তাঁর মহানুভবতা ও মানবিকতার গুণে দেশ-বিদেশের মানুষ তাঁকে মহা-আপন বলে জেনেছে—এ কথাও তেমনি সত্য। সেইজন্যেই বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী অপেক্ষা আরও বড় কিছু—যার জন্যে দেশেবিদেশে তিনি অনাবিল ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছেন। এই ধরনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও মহাপ্রাণ মনীষীর জীবনকথা জানবার জন্যে সকলেরই বিশেষ আগ্রহ। একদিকে বিজ্ঞান যেমন সত্যেন্দ্রনাথেব মনকে আকৃষ্ট কবেছিল—কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও মানব-সংস্কৃতির সকল বিষয়েই তেমনি তিনি অনুরক্ত ছিলেন তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। কী পরিবেশে মানুষ হয়ে তিনি এমন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হ'য়েছিলেন, কীভাবে ও কোথা থেকে তিনি বিজ্ঞান-সাধনায় অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তাঁর সার্বজনীনতার উৎস কোথায়, তাঁর জীবনদর্শন কোন্ পথে তাঁকে. চালিত করে এসেছে—এ সব প্রশ্ন সকলের মনে স্বতঃই উদিত হয়। এই কারণেই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন থেকেই অনুভূত হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে ইতস্ততঃ লেখা সাময়িক পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সম্প্রতি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে—কিন্তু একটি বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের অভাব এ যাবৎ অপূর্ণই রয়েছে। স্নেহাস্পদ শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভাব পূরণে অগ্রসর হওয়ায় দেশবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন সন্দেহ নেই।

লেখক বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত নন। তিনি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিশেষ স্নেহের পাত্র। সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসার পর থেকে লেখক তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-কর্মসচিবরূপে তিনি বহুদিন তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তিনি আচার্য বসুর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের নানা ঘটনা নিজের অভিজ্ঞতায় এবং সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী, সহকর্মী, সুহৃদ ও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সেগুলি সুসংবদ্ধভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। একদিকে

তিনি যেমন আচার্য বসুর প্রতিভাদীপ্ত ছাত্র ও কর্মজীবনের কথা, তাঁর অনন্য-সাধারণ বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা বলেছেন অপরদিকে তেমনি তাঁর বিদগ্ধ মন, তাঁর বিশাল হৃদয়বত্তা ও মহানুভবতা, তাঁর জীবনদর্শন ও মাতৃভাষায় তাঁর নিরলস প্রয়াসের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন।

লেখকের সহজ ও সরল ভাষা এবং রচনাভঙ্গী প্রশংসার যোগ্য মনে করি। ইতিমধ্যে তিনি মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের একটি জীবনী লিখে পাঠকমহলে সমাদর লাভ করেছেন। আইনষ্টাইনের মন্ত্রশিষ্য সত্যেন্দ্রনাথের এই জীবনখানিও সমাদৃত হবে বলে মনে করি। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ লেখক এই গ্রন্থখানি তাঁকে উৎসর্গ করেছেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের এই শ্রদ্ধানিবেদন সার্থক হোক এই কামনা করি।

নিবেদন

মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের একটি জীবনী-গ্রন্থ রচনার পর শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানীর কর্ণধার শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ প্রস্তাব করেছিলেন ভারতের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্মকৃতি সম্পর্কে গ্রন্থমালা প্রকাশ করা যায় কিনা। এদেশে অধিকাংশ পুস্তক-প্রকাশক যেখানে গল্প-উপন্যাস রম্যরচনা প্রকাশে সমুৎসুক, সেখানে বিজ্ঞানীদের জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় কম দুঃসাহসিক ও প্রেরণাদায়ক নয়। তাই এই শুভ প্রস্তাবে পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত বোধ করেছিলুম। এই গ্রন্থমালা সূচনা করার আলাপ-আলোচনা যখন চলছিল, তখন পুজ্যপাদ মাস্টারমশাই বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতমবর্ষ পুর্তি হতে কয়েক মাস বাকী। ইতিমধ্যে তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপনকল্পে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং তার অন্যতম সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়। সে-সময় মাস্টারমশায়ের একটি জীবনী-গ্রন্থ রচনার প্রেরণা বিশেষভাবে অনুভব করি। অরুণবাবুর কাছে যখন এ-প্রস্তাব উত্থাপন করলুম, তিনি সানন্দে এতে সম্মত হলেন। তার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ।

কিন্তু গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে প্রধান সমস্যা হলো সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের উপাদান সংগ্রহ। কারণ আমরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছি অনেক পরে—তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে চলে আসার পর। এ-বিষয়ে মাস্টারমশায়ের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করা সম্ভব ছিল না এবং বহুবার প্রশ্ন করেও বিশেষ কিছু উপাদান সংগ্রহ করতে পারি নি। তখন শরণাপন্ন হলুম ডঃ পুলিনবিহারী সরকার, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীরেন রায়, শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব, অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ মাস্টারমশায়ের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদদের। এই গ্রন্থের নানা উপাদান তাঁদের কাছে থেকে সংগৃহীত, এজন্যে প্রথমেই তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ এবং পরিষদের সারস্বত সংঘের সংঘসচিব ডঃ মহাদেব দত্ত এই গ্রন্থ রচনায় প্রথমাবধি আমাকে উৎসাহদান এবং নানাভাবে সাহায্য করেছেন; তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসুলভ স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। ডঃ শিবব্রত ভট্টাচার্য এবং সর্বশ্রী সত্যব্রত সেন, সমর গুহ ও লীলা ভট্টাচার্য

মাস্টারমশায়ের জীবনের নানা উপাদান ; ডঃ পূর্ণাংশু রায় ও ডঃ গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মাস্টারমশায়ের বৈজ্ঞানিক অবদান বিষয়ে নানা তথ্য দিয়ে এবং শ্রীমান দেবীপ্রসাদ সরকার পাণ্ডুলিপি রচনায় সাহায্য করেছেন—তাঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। এ-ছাড়া, শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'স্মৃতিচারণ', শ্রীসুশীল রায়ের 'মনীষী জীবন-কথা', ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'ঝিলিমিলি' গ্রন্থ থেকে এবং শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীবিষ্ণু দের রচনা থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করেছি। মাস্টারমশায়ের নিজের লেখা রচনা থেকেও সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং অনেক ক্ষেত্রে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা' হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের প্রাক্তন ডীন এবং বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সপ্ততিতম জন্মোৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। গ্রন্থে প্রকাশিত ছবিগুলির মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে গৃহীত ছবিটি বসুবিজ্ঞান মন্দিরের, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে গৃহীত ছবিটি শ্রীমতী নীলিমা ঘোষের, 'বারো-জনা'র ছবিটি ডঃ সর্বাণীসহায় গুহ সরকারের, এস্রাজ বাদনরত ছবিটি শ্রীসুনীল জানার, সপ্ততিতম জন্মোৎসবের ছবিটি জন্মোৎসব কমিটির এবং বাকী ছবিগুলি ডঃ শিব্রবত ভট্টাচার্যের সৌজন্যে পেয়েছি।

মাত্র ষোল বৎসর যাবৎ ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব এই গ্রন্থে কতটুকু পরিস্ফুট করতে পেরেছি জানি না। তবু আশা রাখি, লেখনীর শত অক্ষমতা সত্ত্বেও গুরুর প্রতি শিষ্যের এই শ্রদ্ধার্ঘ্য আন্তরিক বলেই গৃহীত হবে। আমার এই প্রয়াস যদি কিছুমাত্র সার্থক হয়ে থাকে, নিজেকে ধন্য মনে করব। পরিশেষে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থকে—যাঁর অকৃপণ সাহায্য ও অকৃত্রিম সহযোগিতার ফলেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে এবং গ্রন্থ-রচনা বাদে যা কিছু কৃতিত্ব সবই যাঁর প্রাপ্য।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী



শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম-পরিচয়

বিশ্বের ইতিহাসে দেখা যায়, এক একটি জাতির জীবনে কখনও কখনও এমন এক স্বর্ণযুগ আসে, যখন সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্পসংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে শতদল পুষ্পের মতো নানা প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ব্রিটেনের ইতিহাসে এমন এক যুগ এসেছিল রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে, যখন নানা প্রতিভাধর ব্যক্তি জাতীয় সংস্কৃতির সবক্ষেত্রে তাঁদের অনন্যসাধারণ অবদানের স্বর্ণ-স্বাক্ষর অঙ্কিত করেছিলেন। ভারত তথা বাংলাদেশে এমন এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতকে।

এই স্মরণীয় যুগের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার জাতীয় জীবনে রাজা রামমোহনের আবির্ভাবে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আহরণ করে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে রামমোহন আবির্ভূত হলেন ভারতের তৎকালীন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজজীবনে। তখন এদেশের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ও অযৌক্তিক লোকাচার জাতিকে উন্নতির পরিবর্তে অধোগতির দিকে টেনে আনছিল, তিনি তার মূলে দৃঢ় আঘাত করলেন। সংস্কারবদ্ধতা ও ভ্রান্ত লোকাচারের আবিলতায় এতদিন জাতির জীবনস্রোত যে রুদ্ধ হয়েছিল তা মুক্ত করে দিলেন নবযুগের ভগীরথ রামমোহন। মৃতপ্রায় জাতির জীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার এলো।

বাংলাদেশে রামমোহনের কল্যাণহস্তের স্পর্শে নবজাগরণের যে আলোকশিখা প্রজ্বলিত হলো তার অনির্বাণ প্রভা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো বঙ্গ সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে। কত দিকে কত মনীষী কত মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হলো। এলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আশুতোষ, দেশবন্ধু, অরবিন্দ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র—আরও কত মহাজন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতির এমন কোনো ক্ষেত্রই রইলো না যেখানে প্রতিভার সঞ্জীবনী স্পর্শ পড়ে নি তখন।

বাংলাদেশে নবজাগরণের এই ভরা জোয়ার যখন প্রবহমান, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ২২ ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম।

সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের দেশ ছিল কাঁচড়াপাড়ার কাছাকাছি এখন যেখানে কল্যাণী হরিণঘাটা তারই সংলগ্ন বড জাগুলিয়া গ্রামে। কলকাতাতেও গোয়াবাগানে তাঁদের একটি বাড়ি ছিল। মামার বাড়িও কলকাতায়। বাল্যকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার বাসিন্দা, তাই তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে তিনি হচ্ছেন 'ক্যালকেশিয়ান'।

বাল্যকালে সত্যেন্দ্রনাথের জীবন যখন কলকাতায় কেটেছে, তখনকার কলকাতার চেহারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের মতো তখন রাস্তায় রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর সমারোহ ছিল না, গ্যাসের আলো জলত টিমটিম করে। পাকা ড্রেন তখনও দেখা দেয় নি, রাস্তার গায়ে গায়ে ছিল নর্দমা। প্রধান প্রধান রাস্তার উপর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রাম দ্রুত গতিতে ছুটে যেত না, ঢিমেতেতালে চলত ঘোড়ায় টানা ট্রাম।

সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অম্বিকাচরণ বসু সরকারী চাকরি করতেন। সেই কাজে তাঁকে নানা জায়গায় সফর করে বেড়াতে হত। শেষ জীবনে তিনি মীরাটে সরকারী হিসাবরক্ষক (Accountant) ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু মশাই তখন দেশে থেকেই পডাশোনা করতেন। এমন সময় একদিন খবর এলো পিতা অম্বিকাচরণ গুরুতররূপে পীড়িত হয়েছেন। খবর পেয়েই দেশ থেকে সুরেন্দ্রনাথ রওনা হলেন। কিন্তু মীরাটে গিয়ে যখন পৌছলেন তার আগের দিন অম্বিকাচরণ ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

সেবারই সুরেন্দ্রনাথের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু অম্বিকা-চরণের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে এক বিপর্যয় নেমে এলো। সংসারের সব দায়িত্ব পড়লো সুরেন্দ্রনাথের উপর। গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে এসে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় তাঁকে প্রবৃত্ত হতে হলো।

সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে (বর্তমান ইস্টার্ন রেলওয়ে) এবং পরে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে (বর্তমানে অবলুপ্ত) হিসাবরক্ষকরূপে চাকরি

করেন। তিনি খুব উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। চাকরিতে লিপ্ত থাকলেও তিনি সতীশ ব্রহ্ম মশায়ের সহযোগিতায় বাংলা দেশে সর্বপ্রথম রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে (বর্তমান বিধান সরণী) এই প্রতিষ্ঠান ছিল, পরে টালায় এটি স্থানান্তরিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের 'অর্শগন্ধা' নামে একটি টনিক সেসময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

পিতা সুরেন্দ্রনাথের চেহারার সঙ্গে পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের চেহারার সর্বদিক থেকে এক অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। যিনি পূর্বে কখনও সত্যেন্দ্রনাথকে দেখেন নি, তাঁর পক্ষে সুরেন্দ্রনাথকে দেখে সত্যেন্দ্রনাথ মনে করা অস্বাভাবিক নয়। সুখের বিষয়, পিতা সুরেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত আছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মাতার নাম আমোদিনী দেবী। আমোদিনী দেবীর পিতা আন্দুলপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী মতিলাল রায় চৌধুরী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির সমসাময়িক ও বন্ধু। মাতুলদের জমিদারি ছিল এবং মাতুলালয়ে সমারোহে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি হত। মাতুলালয়ে সঙ্গীতচর্চারও যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের মামাতো ভাই শ্রীঅনিল রায় চৌধুরী একজন ভালো সেতারী। সত্যেন্দ্রনাথের মাতা বর্তমানে জীবিত নেই—১৯৩৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

পিতা সুরেন্দ্রনাথ যেমন উদারচেতা ও বিবিধ মানবীয় গুণসম্পন্ন, মাতা আমোদিনী দেবীও তেমনি নানা গুণসম্পন্না ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর মাতাপিতার প্রথম ও একমাত্র পুত্রসন্তান এবং তাঁর ভগ্নী ছ'জন। ভগ্নীদের মধ্যে বর্তমানে তিনজন মাত্র জীবিত আছেন।

১৯১৩ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি এস সি পরীক্ষা পাস করার পর এম এস সি পড়তে পড়তে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। শোভাবাজার রাজবাটির সন্নিকটে কম্বুলিয়াটোলা অঞ্চলের খ্যাতনামা চিকিৎসক

ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র সন্তান শ্রীমতী উষাবতী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহকালে তাঁর দুটি শর্ত ছিল। প্রথম শর্ত বিনাপণে বিবাহ করবেন এবং দ্বিতীয় শর্ত তাঁর ২০০ জন বন্ধু বরযাত্রী যাবেন। বলাবাহুল্য, তাঁর এই দুটি শর্ত রক্ষিত হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র বর্তমান

ছাত্রজীবন

পূর্বেই বলা হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পিতাকে বিশেষ অসুবিধাব মধ্যে পডতে হয়। সংসারের সকল দায়িত্ব তখন পিতা সুরেন্দ্রনাথের উপব এসে পডে। তা ছাড়া, কলকাতায নিজস্ব বাডি থাকা সত্ত্বেও জোডাবাগান অঞ্চলে একটি ভাডা বাডিতে তাঁদের থাকতে হলো। কারণ তাঁদের নিজস্ব বাডিতে আগে থেকেই ভাডাটে ছিল। তখন তাদের ওঠানো সম্ভব ছিল না। এইভাবে সাংসারিক টানাটানির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়।

পাঁচ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম জোডাবাগান অঞ্চলে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন (এই স্কুলে রবীন্দ্রনাথ একদিন ছাত্র ছিলেন)। কিছু কাল এই স্কুলে তিনি পডাব পর তাঁর পিতা গোযাবাগানের নিজস্ব বাডিতে উঠে গেলেন। তখন বাড়িব কাছাকাছি নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে (বর্তমানে এই স্কুলটি অবলুপ্ত) তিনি ভর্তি হলেন। এখানে এণ্ট্রান্স ক্লাসের পুর্ব পর্যন্ত তিনি পডেন। এণ্ট্রান্স ক্লাসে ওঠার পর তাঁব পিতা তাঁকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করে দেন। ১৯০৮ সালে এখান থেকে তাঁর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু বিধি বাদ সাধলেন। পরীক্ষা আবম্ভ হবার ঠিক দুদিন আগে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পডলেন। ফলে সে বছর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। আরও এক বছর তাঁকে হিন্দু স্কুলে পডতে হলো। কিন্তু এই এক বছর তিনি কেবল পুরনো পডায আবদ্ধ থাকতে চাইলেন না, কলেজে প্রবেশ করে গণিতের যেসব বিষয় পড়তে হবে তা তিনি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তাঁর মনে আর একটি ইচ্ছা জাগলো সংস্কৃতে কাব্যপাঠের মধ্য পরীক্ষা দেবেন। তাই কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতির কাব্যাবলী পড়ে ফেললেন।

ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রগাঢ় জ্ঞানানুশীলনের পরিচয় দেন, বিশেষ করে গণিত বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন হিন্দু স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীর (ফার্স্ট ক্লাস) ছাত্র। স্কুলের অন্যতম গণিত শিক্ষক উপেন্দ্র বকসী মশাই একদিন নবম শ্রেণীর (সেকেণ্ড ক্লাস) ছাত্রদের ক্লাসে এসে বললেন, টেস্ট পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সত্যেন্দ্রকে তিনি ১০০-র মধ্যে ১১০ নম্বর দিয়েছেন।

ক্লাসের ছাত্ররা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি কারণে তিনি ১০ নম্বর বেশি দিয়েছেন ?

উত্তরে উপেন বাবু জানালেন, গণিতের প্রশ্নপত্রে ১১টি প্রশ্ন ছিল এবং তার মধ্যে ১০টি অঙ্ক কষতে হবে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ১১টি প্রশ্নই নির্ভুল কষে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, জ্যামিতির এক্সট্রাগুলি ২।৩টি বিভিন্ন উপায়ে সমাধান কবে কষে দেখিয়েছে। এসব কাবণেই তিনি সত্যেন্দ্রকে ১০০-র মধ্যে ১১০ নম্বব দিয়েছেন।

উপেন বাবু সেদিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে পিথাগোরাস (Pythagorus) বা ল্যাপলাস (Laplace)-এর মতো প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ হবে (তাঁব সে ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয় নি, পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে সত্যেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ অবদান তার সত্যতা প্রমাণ করেছিল)।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন জামতাড়া স্কুলের দুটি ছাত্র। প্রথম হন রাধামোহন সিংহ।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন তখন বাংলা দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী স্বদেশী যুগ। সে যুগের প্রভাব অন্যান্যদের মতো ছাত্রসমাজের উপরও পড়েছিল। সর্বদিক থেকে দেশকে তখন স্বাবলম্বী করার চেষ্টা চলেছে।

সেসময় যাঁরা কৃতী ছাত্র হতেন তাঁরা বেশির ভাগই আইন পড়ে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টায় ব্রতী হতেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ একদল ছাত্র ভাবলেন—যে বিজ্ঞানের বলে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ এত উন্নত

হয়েছে সেই বিজ্ঞানের চর্চা করলে তাঁবা দেশের প্রগতিতে বেশি সাহায্য করতে পাববেন। সেই আগ্রহে তাঁরা আই.এস সি পড়তে মনস্থ কবলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুল থেকে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। হিন্দু স্কুল থেকে পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে হয—ওটা ছিল যেন সেসময়কাব ছাত্রমহলেব একটা অলিখিত নিয়ম।

সত্যেন্দ্রনাথেব সঙ্গে আবও কয়েকজন কৃতী ছাত্র সেবছব প্রেসিডেন্সি কলেজেব মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে (আই এস সি) ভর্তি হন। তাঁদের মধ্যে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, নিখিলবঞ্জন সেন, পুলিনবিহারী সরকাব, মানিকলাল দে, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমবেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথের অসাধাবণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ন মেধা শিক্ষক ও সহপাঠীদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। সেসময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজেব শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন একদল কৃতী ও যশস্বী অধ্যাপক। ইংবাজি পডাতেন পার্সিভাল সাহেব, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, গণিতে বঙ্কিমদাস বন্দ্যোপাধ্যায, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায, ডি এন মল্লিক, পদার্থ-বিদ্যায আচার্য জগদীশচন্দ্র, সুবেন্দ্রনাথ মৈত্র, বসায়নশাস্ত্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র; শাবীরবিদ্যায় সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ। এঁদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেব নাম তখন ছাত্রমহলে সমধিক খ্যাত। এঁদের দুজনের কাছে পডার সৌভাগ্য পেলে ছাত্রবা নিজেদের জীবন ধন্য বলে মনে করত।

সত্যেন্দ্রনাথ যেমন একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, তেমনি তাঁর কিশোবসুলভ দুষ্টামিও ছিল প্রচুর। মাঝে মাঝে কুটিল প্রশ্ন করে অধ্যাপকদেব বেশ বিব্রত করতেন।

একবার আই এস সি ক্লাসে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বলবিদ্যার force × distance = work সংজ্ঞাটি ছাত্রদের কাছে ব্যাখা করছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ মাস্টার মশায়ের ব্যাখ্যা বুঝতে না পারার ভান করে কুটিলভাবে জিজ্ঞেস করলেন—"স্যার, একটা ভারী পাথর ঠেলে ঠেলে ঘর্মাক্ত

হয়েও যদি আমি সেটাকে একচুল নড়াতে না পারি, তা হলে কি work হলো না ?"

সত্যেন্দ্রনাথের এই বুদ্ধিদীপ্ত কুটিল প্রশ্ন শুনে মাস্টার মশাই কিন্তু অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং খুশীই হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম সহপাঠী ডঃ পুলিনবিহারী সরকারের কাছে শুনেছি—ক্লাসে পেছনের দিকে বেঞ্চে বসে সহপাঠীদের সঙ্গে গল্পও করতেন সত্যেন্দ্রনাথ। একদিন অঙ্কের ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছেন। এমন সময় গণিতের অধ্যাপক মশায়ের দৃষ্টি পড়লো তাঁর প্রতি। বোর্ডের কাছে সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি ডেকে পাঠালেন।

সত্যেন্দ্রনাথ কাছে এলে অধ্যাপক মশাই বললেন, "যে অঙ্কটা বোর্ডে কষাচ্ছিলুম, সেটা করো তো।"

মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে খড়ি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই বোর্ডে অঙ্কটি কষে দিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করলেও তাঁর চোখ ছিল বোর্ডের অঙ্কের দিকে। তাই অঙ্ক কষতে তিনি ভুল করেন নি বিন্দুমাত্র।

অধ্যাপক মশাই তখন খুশী হয়ে সত্যেন্দ্রনাথকে বললেন, "যাও, আর কখনও গল্প করো না।"

আর একদিন বেকার ল্যাবরেটরীতে পদার্থবিদ্যার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে শিক্ষক মশাই সত্যেন্দ্রনাথকে টেলিস্কোপ (দূরবীক্ষণ) অনন্তে (infinity) ফোকাস করার কাজ দিয়েছিলেন। তখন বেকার ল্যাবরেটরীর সামনে একটি বাড়িতে দুপুরের দিকে কয়েকজন মহিলা বসে তাস খেলতেন। দূর থেকে তাঁদের দেখা যেত। সত্যেন্দ্রনাথ দুষ্টুমি করে টেলিস্কোপ সেদিকে ফোকাস করলেন। তারপর শিক্ষক মশাইকে ডেকে এনে বললেন, "স্যার, দেখুন তো ঠিক ইনফিনিটিতে ফোকাস করা হয়েছে কিনা ?"

শিক্ষক মশাই টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "না, না, এদিকে নয়, অন্যদিকে ফোকাস কর।"

সত্যেন্দ্রনাথের অপর একজন কৃতী সহপাঠী ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোনা দু একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি তাঁরই নিজের ভাষায়—



ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ (১৯১০-১১)



সুরসাধনায় আত্মমগ্ন সত্যেন্দ্রনাথ



আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ (১৯২৮)

বেদীতে উপবিষ্ট (বামদিক থেকে)—নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, স্নেহময় দত্ত।
মাটিতে উপবিষ্ট (বামদিক থেকে)—নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু।

"আমাদের মধ্যে যৌবন উন্মেষসুলভ চপলতা যে ছিল না তা বলতে পারি না। মনে পড়ে যখন ডঃ শ্যামাদাস মুখার্জি একটা ছোট ঘরে যাবা আগে ভর্তি হয়েছে তাদের নিয়ে বিয়োগাঙ্ক একেব বর্গমূল ও কাল্পনিক সংখ্যা বোঝাতে আবম্ভ কবেন, তখন ক্লাসের অনেকেই জুতো দিয়ে খসখস করতে থাকে। সেদিন সত্যেন ক্লাসে ছিল কিনা আমাব মনে পড়ে না। কাবণ তখনও পর্যন্ত তাব সঙ্গে আমার পবিচয় হয় নি। কিন্তু অধ্যাপক মশাই কিছুই গ্রাহ্য কবলেন না—অবিচলিতভাবে কালো বোর্ডে অঙ্ক কষে যেতে লাগলেন। পবেব দিন ক্লাসে যাবাব আগে আমরা জানতে পাবলুম, তিনি একজন খ্যাত-নামা গণিতজ্ঞ। সেদিন থেকে জুতোব খসখসানি সব নীবব হয়ে গেল।"

আব একটি ঘটনা—"এইচ আব জেমস তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ছুটিতে বিলাতে গেলে পার্সিভাল সাহেব তাঁর স্থলে অস্থায়ী অধ্যক্ষের কাজ কবেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কোনো ছেলে ভর্তি হতে চাইলে তিনি বাধা দিতেন না। এতে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি ছাত্র কোনো কোনো ক্লাসে হয়ে গেল এবং শিক্ষকেব সংখ্যা সে তুলনায় হলো কম। ফলে আমাদের অঙ্কের ক্লাস বিজ্ঞান ও কলা বিভাগেব ছাত্রদেব নিয়ে একসঙ্গে বসত। রঘুপতি ঘটক মশাই আমাদেব সম্মিলিত ক্লাস বেশিব ভাগ নিতেন। তিনি চক নিয়ে বোর্ডে কিছু লিখতে গেলে দেখা যেত, ঝাড়ন ফ্যানেব ওপব পড়েছে এবং চারিদিক থেকে চকেব গুঁড়ো বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ঘটক মশাই ক্রমে ক্রমে সকলের নাম জেনে নিলেন। তাঁব অমাযিক শিষ্টতা ও অদম্য ধৈর্য শেষকালে ছাত্রদের হৃদয় জয় কবলো। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি, আমরা কিশোর-সুলভ চপলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ করতুম যদিও, কিন্তু কখনও কোনো ছাত্র অধ্যাপক মশায়েব সঙ্গে সাক্ষাৎ অপমানসূচক ব্যবহার কবে নি।"

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে শুনেছি—সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুবাগ ছিল গভীব। সত্যেন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন জানা গেল পার্সিভাল সাহেব কয়েকদিন পরেই অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে ভারত ছেড়ে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করবেন। একথা শুনে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কাছে আর্জি পেশ করলেন, কিছুদিনের জন্যেও

অন্তত তাঁরা পার্সিভাল সাহেবের কাছে পড়তে চান। অধ্যাপক পার্সিভাল বি এ ক্লাসের নিচে পড়াতেন না। কিন্তু ছাত্রদের এই আবেদনের কথা অবগত হয়ে তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং জানালেন অধ্যাপক ঘোষের পরিবর্তে তিনি মিলটনের 'কোমাস'-এর অবশিষ্টাংশ পড়াবেন।

সেবছর মাধ্যমিক শ্রেণীর টেষ্ট পরীক্ষায় পার্সিভাল সাহেবই ইংরেজী রচনার অংশ পরীক্ষা করলেন স্বেচ্ছায়। তিনি দুটি ছাত্রকে ১০০ মধ্যে ৬০ দেন। তাদের মধ্যে একজন কলা বিভাগের, অপরজন বিজ্ঞান বিভাগের সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের খাতার উপর তিনি লিখে দিয়েছিলেন ৬০ + ১০ এই মন্তব্য করে যে, "এই ছাত্রটি অসাধারণ, এর নিজস্ব কিছু বলবার ক্ষমতা আছে।"

সত্যেন্দ্রনাথের অপর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী শ্রীগিবিজাপতি ভট্টাচার্যেব কাছে শুনেছি—কলেজে পড়ার যুগে সত্যেন্দ্রনাথের একদিকে যেমন ছিল পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বহু বিষয়ে ঐকান্তিক চর্চা ও এষণা, অন্যদিকে তেমনি ছিল বহুজনেব সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহ। বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতেব জন্যে তিনি তখন কলকাতাব দূব দূর জায়গায় যেতেন। সেসময়ে বালিগঞ্জেব ট্রাম ছিল না, সারকুলার রোডের ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এসে হেঁটে যেতেন বালিগঞ্জে।

যে শ্রেণীতে তিনি পড়তেন তাঁর উচ্চতর শ্রেণীব পাঠ আয়ত্ত কবে নিতেন। এণ্ট্রান্সের সময় যেমন আই এস সি'র পড়া দখল করে নিয়েছিলেন, তেমনি আবার আই এস সি'র সময় বি এস সি'র পড়া শেষ করেছিলেন। শুধু নিজের পড়া নয়, বন্ধুদেবও পড়াতে সাহায্য করতেন। নীরেন্দ্রনাথ (অধ্যাপক নীরেন রায়), হারীতকৃষ্ণ (দেব), হরিশচন্দ্র (সিংহ), গিরিজাপতি (ভট্টাচার্য) প্রভৃতি তাঁর নিচু শ্রেণীর বন্ধুরা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে নিয়মিত পড়তে যেতেন। এমন কি উপরের শ্রেণীর বন্ধুদেরও পড়াতে তিনি সাহায্য করতেন বলে শোনা যায়।

ছাত্রজীবন থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের পাঠ্যাতিরিক্ত বহু বিষয়ে অধ্যয়ন ও অনুশীলনের গভীর আগ্রহ ছিল। মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে পড়াকালীন একদিকে তিনি যেমন ত্রিকোণমিতি ও কলন (ক্যালকুলাস্) কষতেন, সেই

সঙ্গে গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনির বই পড়তেন, টেনিসনের 'In Memorium' থেকে অনর্গল মুখস্থ বলতেন, কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব শেষ করেছিলেন। এ সব পড়তেন গভীর রাত্রি অবধি (সত্যেন্দ্রনাথের বিবিধ বিষয়ে এই জ্ঞানচর্চা ও অধ্যয়নের আগ্রহ এখনও পুরোমাত্রায় বজায় আছে)।

কলেজে ছুটির পর অবসরটুকু ও ছুটির দিনগুলি সত্যেন্দ্রনাথ প্রায়ই অতিবাহিত করতেন বন্ধুদেব সঙ্গে। বন্ধুদেব বাড়ি গেলে অনেকক্ষণ সেখানে কাটিযে আসতেন।

বাগবাজারে গিরিজাপতিদের বাড়ি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম আড্ডাস্থল। এখানে সত্যেন্দ্রনাথ, হরিপদ মাইতি, ডঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, (গিরিজাপতির দাদা), শিল্পী যামিনী রায়. ভূপালভূষণ ভট্টাচার্য (গিরিজাপতিদের আত্মীয়) রজনী পালিত, প্রমথ মিত্র ও হারীতকৃষ্ণকে নিয়ে আড্ডা বসত। পরে সত্যেন্দ্রনাথ এই আড্ডায় ধূর্জটিপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়), নীরেন্দ্রনাথ ও হরিশচন্দ্রকে ধরে আনেন। আড্ডায় গান ও সাহিত্যচর্চা হত। সেই সঙ্গে ছিল জলযোগের ব্যবস্থা। আড্ডা বসলে দিনান্ত পার হয়ে সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত অগ্রসর হত।

আড্ডায় সত্যেন্দ্রনাথ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব', 'মরণ', 'সোনার তরী', 'ব্রাহ্মণ', 'পুবাতন ভৃত্য', 'উর্বশী', 'বর্ষামঙ্গল', 'অভিসার', 'বিসর্জন', 'পরিশোধ' প্রভৃতি কবিতাগুলি তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কবিতাগুলিও ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। সত্যেন্দ্রনাথের দরদভরা কণ্ঠের আবৃত্তি বন্ধুদের মুগ্ধ করত।

এই সময় সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহে ও সম্পাদনায় 'মনীষা' নামে একটি হাতেলেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বার করা হয়। এই পত্রিকায় তিনি 'সূচনা ও পরিণতি', 'জীবনদর্শন' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ এবং একটি রোমান্টিক গল্প লিখেছিলেন। মাত্র তিনটি সংখ্যা বার হবার পর এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধুদের আর একটি আড্ডাস্থল ছিল হেদুয়ার (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) প্রাঙ্গনে উন্মুক্ত গগনতলে। কলেজের ছুটির

পর সেখানে এসে তাঁরা মিলিত হতেন। এ আড্ডায় প্রধান খোরাক ছিল গান। গাইতেন হারীতকৃষ্ণ শুধু গলায় বিনা সঙ্গতে। তখন হেদুয়ায় লোকের এত ভীড ছিল না, আর সাঁতারের ক্লাবও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যাঁরা হাওয়া খেতে ও বেড়াতে আসতেন সেখানে, তাঁদের ভ্রূকুটি ও কৌতূহল ভ্রূক্ষেপ না করে চলত প্রাণখোলা গানের আসর। হারীতকৃষ্ণের সুমধুর কণ্ঠস্বরের সঙ্গীত তাঁর বন্ধুদের যেমন মুগ্ধ করত, তেমনি আকৃষ্ট করত হেদুয়ার অপরিচিত শ্রোতাদেরও। হারীতকৃষ্ণ রবীন্দ্র সঙ্গীতই পরিবেশন করতেন বেশি। তাঁর গাওয়া 'বল দাও মোরে', 'তোমারি অসীমে প্রাণমন লয়ে', 'বাঁশরী বাজাতে চাহি', 'কেন যামিনী না যেতে' গানগুলি ছিল বন্ধুদের বিশেষ প্রিয়। এই আসরে আর একজন সঙ্গীত পরিবেশক ছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে গাওয়া 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' গানখানি অভিভূত করত সকলকে।

এ ছাড়া আর একটি আড্ডার জায়গা ছিল হারীতকৃষ্ণের বাড়ি। সত্যেন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁর অনেক বন্ধুই সেখানে উপস্থিত হতেন। হারীতকৃষ্ণের পিতা অসীমকৃষ্ণ দেব মশাই পরম স্নেহে তাঁদের সকলকে অভ্যর্থনা করতেন। ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক অনেক কিছু ঘটনার অভিনব ব্যাখ্যা করা ছিল তাঁর সখ। হারীতকৃষ্ণের গান শুনতে বন্ধুদের আগ্রহ দেখে তিনি একটি দামী অর্গান কিনে দেন।

হারীতকৃষ্ণের বাড়িতে পরে আরও জমাট বৈঠক বসত। সে বৈঠকে যোগ দিতেন বহু গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি। সেখানে আসতেন প্রমথ চৌধুরী মশাই, রসরাজ অমৃতলাল বসু। রসরাজ স্মৃতি থেকে শেকসপীয়র, মিলটন প্রমুখ কবিদের কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করতেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত রসালাপে বৈঠকে হাসির বন্যা বয়ে যেত।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এইভাবে আড্ডা ও আসরে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথের পাঠচর্চা কোনোক্রমে বিঘ্নিত হয় নি। ১৯১১ সালে মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারের তাঁর এই যে গৌরবোজ্জ্বল সূচনা হলো তা

সর্বোচ্চ পরীক্ষা পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল—কোনো পরীক্ষায় তিনি প্রথম ছাড়া অন্য কোনো স্থান অধিকার করেন নি। আই এস সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মেঘনাদ সাহা, তৃতীয় মানিক দে, চতুর্থ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং পঞ্চম প্রাণকৃষ্ণ পারিজা (উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য)।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হবার সময় ঢাকা কলেজ থেকে মেঘনাদ সাহা এসে তাঁর সহপাঠীরূপে যোগদান করেন। তাঁরা দুজনেই গণিত বিষয়ে অনার্স নেন। এই সময় থেকে তাঁদের দু-জনের মধ্যে যেমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তেমনি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতারও সূচনা হয়।

বি এস সি ক্লাসে তাঁদের অধ্যাপক ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং গণিত অনার্স পড়াতেন বঙ্কিমদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাপ্রসন্ন দাস, রঘুপতি ঘটক, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (ডি এন মল্লিক)। আচার্য জগদীশচন্দ্র পড়াতেন বিদ্যুৎতত্ত্ব ও আলোকতত্ত্ব। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বিষয় তিনি খুব আকর্ষণীয় করে পড়াতেন এবং ছাত্ররা তাঁর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত। সেসময় জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণাও করছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের রাজ্য থেকে সরে গিয়ে উদ্ভিদ-জগতে প্রাণের বিচিত্র অভিব্যক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটনে হঠাৎ মগ্ন হন। তাঁর এই সব পরীক্ষামূলক গবেষণা ছাত্রমহলে বিপুল আলোড়ন ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁর কাছে যাবার সাহস হত না ছাত্রদের। তারা দূর থেকে শ্রদ্ধানিঃসৃত বিস্ময়ে জগদীশচন্দ্রের গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করবার যন্ত্র অথবা বেতার তরঙ্গ উৎপাদন করবার যন্ত্র উঁকিঝুঁকি মেরে দেখত।

বি এস সি পড়ার সময়েও সত্যেন্দ্রনাথ পূর্বের মতো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় ও আসরে যোগ দিতেন। এই সময় সমাজসেবা ও সংগঠন কাজেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রথমটি হলো অনুশীলন সমিতি এবং দ্বিতীয়টি ওয়ার্কিং মেনস্ ইনস্টিটিউট।

অনুশীলন সমিতি বোমার যুগের। সেখানে লাঠিখেলা, ছোরা ও তলোযাব খেলা শেখানো হত। উচ্চস্তরে গোপনে পিস্তল ছোড়া, বোমা তৈবি করা ইত্যাদি শেখানো হত। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ওপরওয়ালাদের কয়েকজনের আলাপ-পরিচয় ছিল বলে শোনা যায়।

অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে গোয়াবাগান অঞ্চলে বয়েজ ওন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয। ১৯০৯ সালে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

ওযার্কিং মেনস্ ইনষ্টিটিউট ছিল দিনমজুরদের জন্যে নৈশ বিদ্যালয়। মজুর শ্রেণীব লোক যারা দিনে খেটে খায তাদের লেখাপডা শেখাবার জন্যে এই নৈশ বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত হয। এই বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত-অধ্যাপক ডঃ ডি এন মল্লিক এবং সম্পাদক ছিলেন সত্যানন্দ রায (পববর্তীকালে তিনি কলিকাতা পৌরসংস্থাব শিক্ষা-অধিকর্তা হযেছিলেন)। উত্তর কলকাতাব মানিকতলা মেন বোডে (বর্তমান রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট) কেশব একাডেমির গৃহে এই নৈশ বিদ্যালয বসত। সত্যানন্দ রায, সুশীল আচার্য, অসীমকৃষ্ণ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, হরিশচন্দ্র, নীরেন্দ্রনাথ, গিবিজাপতি এখানে পডাতেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে বাত্রি ৯টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজ চলত। কেরোসিন তেলের আলোতে মজুবদের এখানে লেখাপডা শেখানো হত। মজুবদেব কাছ থেকে [illegible] পয়সা নেওয়া হত না, যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন উদ্যোক্তারা [illegible]সায়। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এই নৈশ বিদ্যালয়ের কাজ চলেছিল। তা'ও [illegible]বাদী সন্দেহে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি পডায় এটি বন্ধ [illegible]য।

অধ্যাপক নীরেন রায়ের কাছে শুনেছি—ছাত্রজীবনে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন পডাশোনা নিয়ে মত্ত থাকতেন, তেমনি ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, দাবা, তাস খেলাতেও ছিল তাঁর বিপুল আগ্রহ ও পারদর্শিতা।

ছাত্রাবস্থা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যেত, এক এক সময় এক এক বিষয়ে তাঁর রোখ চাপে। তখন কিছুদিন ধরে অনন্যকর্মা হয়ে তাতেই মেতে থাকেন। আই এস সি পরীক্ষার কিছুকাল আগে ক্যারম খেলা যখন প্রথম শেখেন তখন দিনরাত্রি তাই নিয়ে মেতে

রইলেন। তা দেখে তাঁর মা বললেন, "পরীক্ষায় তুই এবার ফেল করবি।" কিন্তু সে পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম হলেন। অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা উচ্চতর বীজগণিতের বইটি নিয়ে বসলেন এবং সব অঙ্ক শেষ করে রাত্রি ৩টায় উঠলেন।

মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়াকালে সত্যেন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায় (পরবর্তীকালে চিত্র-পরিচালকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন) প্রমুখ কয়েকজন সহপাঠী দুপুরে ক্লাসের রুটিনে ফাঁক থাকলে ফুটবল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ গোল-রক্ষক হিসেবে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। দুপুরে ক্লাসের ফাঁকে ফুটবল নিয়ে তাঁদের এই মাতামাতি কিন্তু বেশিদিন টেঁকে নি। কয়েকদিন পরে অধ্যক্ষের নির্দেশে তাঁদের খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

পড়াশোনা ও খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশসেবার কাজেও সত্যেন্দ্রনাথ অংশ গ্রহণ করতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে গঙ্গার ধারে যেতেন এবং রাখীবন্ধন উৎসবে উৎসাহ সহকারে যোগ দিতেন।

১৯১৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ যখন এম এস সি ক্লাসের ছাত্র, তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হ্যারিসন সাহেব দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্রকে হঠাৎ অপমান করেন। খবর প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রমহলে ধর্মঘট দেখা দেয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্রদের সভায় এই জাতীয় অপমান সহ্য না করার জন্যে বক্তৃতা দেন। অবশ্য দিনের শেষে হ্যারিসন সাহেব নতি স্বীকার করায় ব্যাপারটা সেদিনই মিটে যায়।

১৯১৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ গণিত বিষয়ে অনার্স সহ বি এস সি পরীক্ষা দেন। গণিত অনার্স পরীক্ষার তৃতীয় পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকটা অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে আসেন। এই প্রসঙ্গের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক নীরেন রায়ের ভাষাতেই সেটা এখানে উল্লেখ করছি—"সেদিন আমরা হেদুয়ায় সত্যেনের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি। এমন সময় সত্যেন মুখ কালো করে এলো। বললে, পরীক্ষা ভালো হয় নি। জীবনে এই প্রথম কয়েকটা অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে

এলুম (এর আগে alternative পর্যন্ত সব অঙ্কই ও করত)। ফলে পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক ও পায় নি, তবে প্রথম হয়েছিল। কেম্ব্রিজের সিনিয়র র‍্যাঙলার পরাঞ্জপে সাহেব এমন কঠিন ও দীর্ঘ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেছিলেন যে সত্যেনের পক্ষেও তিনঘণ্টার মধ্যে ৭৮নম্বরের বেশী উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।"

১৯১৩ সালে বি এস সি পরীক্ষায় গণিত অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করলেন সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় মেঘনাদ এবং তৃতীয় নিখিলরঞ্জন। এঁরা তিনজনই মিশ্র গণিত নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম এস সি পড়েন।

এম এস সি ক্লাসে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জে এম বোস, অধ্যাপক কালিস (Cullis) প্রভৃতিকে তাঁরা শিক্ষকরূপে পান। বিশ্ববিদ্যালযের তৎকালীন গণিত শিক্ষক মহলে এঁদের খ্যাতি ছিল সমধিক।

১৯১৫ সালে এম এস সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদের প্রতিযোগিতার ফল হলো পুর্ববৎ অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ হলেন প্রথম এবং মেঘনাদ হলেন দ্বিতীয়। অসুস্থতার জন্যে নিখিলরঞ্জন সেবছর এম এস সি পরীক্ষা দেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা থেকে শুরু করে সবশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সমভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল রেখে সত্যেন্দ্রনাথ এইভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের পাঠ সমাপ্ত করেন। ছাত্রাবস্থায় যাঁদের তিনি সতীর্থরূপে পেয়েছিলেন--মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিন বিহারী সরকার প্রভৃতি, তাঁরা সকলেই পরবর্তীকালে কৃতী বিজ্ঞানী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এতগুলি মেধাবী বিজ্ঞানের ছাত্রের সমাবেশ এর আগে বা পরে আর কখনও দেখা যায় নি।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলে আসার কিছু দিন পরে সেখানে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক অধ্যাপক মিঃ ওটেন ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার করায় একদল ছাত্র উত্তেজিত হয়ে

তাঁর গায়ে হস্তক্ষেপ করে। সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং ছাত্রসমাজের মধ্যমণি। যদিও সুভাষচন্দ্র নিজে মিঃ ওটেনকে আঘাত করেন নি, তবু সন্দেহবশে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হলো। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কলকাতার কলেজীয় ছাত্রমহলে তখন গভীর আলোড়ন সঞ্চার হয়েছিল।

কর্মজীবন

সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুকাল (প্রায় একবছর) পরলোকগত প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা ও চিত্র-পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়াকে গৃহশিক্ষকরূপে আই এস সি পড়িয়েছিলেন।

এরপর সত্যেন্দ্রনাথ বিহারের পাটনা কলেজে অধ্যাপকপদের জন্যে একটি আবেদনপত্র পাঠান। প্রত্যুত্তরে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জানালেন, তাঁরা এরকম একজন কৃতী এম এস সি (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) চান না, চান একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এস সি।

আর একবার চাকরির জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ দরখাস্ত করেছিলেন। এবারেরটি হাওয়া অফিসে (Meteorological office)। সেখান থেকেও পূর্বোক্তরূপ জবাব এলো—বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম একজন কৃতী ছাত্রের পক্ষে এই কাজ অনুপযুক্ত। তিনি অন্যত্র তাঁর গুণের উপযুক্ত কাজের জন্যে আবেদন করলে ভালো হয়।

এই পরিস্থিতিতে সত্যেন্দ্রনাথ যখন ভাবছেন 'কি করা যায়', এমন সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষের (১৯০৬-২৪ সালের মধ্যে ১৪ বছরের উপর স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন) কাছ থেকে আহ্বান এলো সদ্যস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের জন্যে।

১৯০৭ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে যদিও বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ ও বন্দোবস্তের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তখনও পর্যন্ত এম এস সি শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করতে পারেন নি। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো দু একটি বড় কলেজেই এম এস সি ক্লাস খোলবার উপযোগী যন্ত্রপাতি ছিল এবং ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সেখানেই এম এস সি পড়ানো হত।

এই সময় বাংলার শিক্ষাজগতের দুই দানবীর স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষের দানকে কেন্দ্র করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারত সরকারের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন জানালেন। যে কারণেই হোক ভারত সরকার এ বিষয়ে অর্থ সাহায্যের তেমন ভরসা দিলেন না। কিন্তু স্যার আশুতোষ হতোদ্যম হলেন না। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হয় এবং ঐ বছর ২৭ মার্চ বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সামনে স্যার আশুতোষ ৯২ আপার সারকুলার রোডে (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) বিজ্ঞান কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কবেন।. কিন্তু ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হয় ১৯১৭ সাল থেকে।

৯২ আপার সারকুলার রোডের বাড়িতে বিজ্ঞানের সকল বিভাগের স্থান সংকুলান সম্ভব হয় নি। এখানে প্রথমে পদার্থবিদ্যা, বসায়ন, ফলিত গণিত, মনোবিদ্যা ও শারীরবৃত্তের অধ্যায়ন ও গবেষণার বন্দোবস্ত করা হয়। উদ্ভিদ-বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে স্যার তারকনাথ পালিতের বাড়িতে চালু করা হয়। নৃতত্ত্ব পডাবার বন্দোবস্ত সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্‌ডিং-এ করা হয়। ভূতত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজে পডাবার ব্যবস্থা হয় এবং অমিশ্র গণিত আগে থেকেই দ্বারভাঙ্গা বিল্‌ডিং-এ পডানো হত।

।র তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিভিন্ন দফায় যে অর্থ বিজ্ঞান কলেজের জন্যে দান করেন তা থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপক এবং ঘোষ অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে খয়রার াশ্বরী দেবীর প্রদত্ত অর্থসাহায্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও কৃষিবিদ্যায় য়রা অধ্যাপকের পদও সৃষ্টি হয়। পদার্থবিদ্যায় প্রথম পালিত গার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (১৯১৭-৩৪), প্রথম ঘোষ অধ্যাপক ন বসু (১৯১৪-৩৪) এবং প্রথম খয়রা অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা)। রসায়নশাস্ত্রে প্রথম পালিত অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রথম ঘোষ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র (১৯১৭-৩৭) এবং প্রথম

খয়রা অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২১-৩৮)। ফলিত গণিতশাস্ত্রে প্রথম ঘোষ অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ (১৯১৫-১৮)। ফলিত রসায়নশাস্ত্রে প্রথম ঘোষ অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন (১৯২০-৩৬)। ফলিত পদার্থবিদ্যায় প্রথম ঘোষ অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯২০-)। কৃষিবিদ্যায় প্রথম খয়রা অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২১ ৩১)।

৯২ আপার সারকুলার রোডে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের যখন গোড়াপত্তন হয়, তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে এই বাড়িতে গবেষণা শুরু করেন। এ কারণে তখন অনেকে মনে করতেন—এই তিনতলা বাড়ি কেবলমাত্র উচ্চতর রসায়ন শিক্ষায় ও গবেষণায় নিয়োজিত হবে।

এই সময় অর্থাৎ ১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ ডেকে পাঠালেন সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ প্রমুখকে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাস শুরু করা হলে তোরা পড়াতে পারবি ?"

তাঁরা উত্তর দিলেন, "পারব"।

তখন স্যার আশুতোষ বললেন, "তার আগে তা হলে তোদের একবছর পড়ে নিতে হবে।" এই বলে তিনি তাঁদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

এক বছর বিশেষ পাঠ গ্রহণের পর সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ বিজ্ঞান কলেজের মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয় বিভাগেই পড়াবার এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগে কোনো অধ্যাপক না থাকায় শৈলেন ঘোষ প্রভৃতির সহযোগে বিভাগটি সংগঠনের ভার নিলেন। উচ্চতর পদার্থবিদ্যা পঠনপাঠন ও গবেষণায় তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ গ্যাসীয় পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হলো বিশিষ্ট ইংরেজি পত্রিকা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন-এ (Philosophical Magazine)। এই নিবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ যে সূত্র প্রমাণ করেন সেটি 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ' (Saha-Bose Equation of State) নামে সুপরিচিত হয়।

১৯২০ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার-রূপে একযোগে কাজ করেছিলেন। তারপর তাঁরা দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

এই সময় আইনষ্টাইন (Einstein) এবং মিনকওস্কি (H. Minkowskei) রচিত আপেক্ষিকতাবাদের কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধ মূল জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষাতে অনুবাদ করেন সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ। এই অনূদিত নিবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ভূমিকাসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। শোনা যায়, এই গ্রন্থটি আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদের প্রথম ইংরেজি তর্জমা।

১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন রীডারের পদ ছিল না, ছিল শুধু লেকচারার ও প্রফেসার এ দুটি পদ। ঢাকায় রীডারের পদের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু আবেদন করেন নি, আমন্ত্রণক্রমেই এই পদ পেয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের ঢাকায় যাবার কথা শুনে স্যার আশুতোষ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "কেন যাচ্ছিস? তোর মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি, এখানেই থাক।"

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "আমি যাব বলে কথা দিয়েছি।"

এ কথা শুনে স্যার আশুতোষ ক্ষুণ্ণ হলেন। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, "যা তুই। আমি নিজেই পড়াব।"

সত্যেন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় যান, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবেমাত্র গোড়াপত্তন হয়েছে। ৬০ লক্ষ টাকা ঢেলে গড়ে তোলা হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষের হাতে তখন অঢেল টাকা, তাই মোটা টাকার গ্রেডে তাঁরা রীডার ও অধ্যাপক নিযুক্ত করতে লাগলেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দালান তুলতেই অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। তখন কর্তৃপক্ষ পড়লেন মুশকিলে। তাঁরা ঠিক করলেন, পূর্বঘোষিত গ্রেড তাঁরা সংশোধন করবেন। গ্রেড কমিয়ে দেওয়া হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য অধ্যাপক (যাঁরা ইতিপূর্বেই নিযুক্ত হয়েছেন) এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তাঁরা বললেন, ইতিপূর্বেই যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন করা চলবে না। যাঁদের নতুন নিয়োগ করা হবে তাঁদের এই নতুন স্কীম দেওয়া যেতে পারে।

কর্তৃপক্ষ জানালেন তা নাকি সম্ভব নয়।

তখন সবদিক বজায় রেখে তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথকে একটা প্রস্তাব দিলেন। বললেন, সংশোধিত গ্রেড তিনি গ্রহণ করুন, কর্তৃপক্ষ নিজের খরচে তাঁকে ইউরোপে পাঠাবেন।

প্রস্তাবটি শুভ, তাই সত্যেন্দ্রনাথ এতে সম্মত হয়ে গেলেন।

এদিকে কর্তৃপক্ষও হুঁশিয়ার। তাঁরা ভাবলেন—খরচপত্র করে যাঁকে তাঁরা পাঠাচ্ছেন, তাঁর 'প্রবাসে দৈবের বশে জীবনতারা যদি খসে এ-দেহ আকাশ হতে'—তা হলে তো তাঁদের সব খরচপত্রই 'ভস্মে ঘি ঢালা'র সামিল হবে। তাই তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের জীবনবীমা করালেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রফা হলো—বীমার প্রিমিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই দেবেন এবং অঘটন কিছু ঘটলে বীমার টাকাটাও পাবেন বিশ্ববিদ্যালয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে যোগদান করলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই বিভাগের সংগঠনেও তাঁকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হলো।

ঢাকায় অধ্যাপনাকালে ১৯২৩-২৪ সালে তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর একটি গবেষণা নিবন্ধ ব্রিটেনের বিশিষ্ট পত্রিকা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যে কোনো কারণে হোক সেই নিবন্ধটি প্রকাশে কালক্ষেপণ করেন। এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের কাছে প্রবন্ধের একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলেন।

ফিল-ম্যাগ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রকাশে তৎপরতা না দেখালেও আইনষ্টাইন কিন্তু তাঁর পত্রপ্রেরকের নিবন্ধের সারবত্তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজে সেটি জার্মান ভাষায় তর্জমা করলেন এবং জার্মানীর বিশিষ্ট পত্রিকা 'ট্সাইটশ্রিফট ফ্যুর ফিজিক্স' (Zeitschrift fur Physik)-এ প্রকাশ করতে দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথকে একটি চিঠি দিয়ে তাঁর অভিমতও জানালেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই কাজটি 'বোস আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' (Bose-Einstein Statistics) বা শুধু 'বোস সংখ্যায়ন' নামে সুবিদিত।

আইনষ্টাইনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এই চিঠি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথের খুব সুবিধা হয়ে গেল। তিনি সেই চিঠি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেখালেন। এতে তাঁর বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা আরও পাকা হলো। সত্যেন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠানো সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনে এতদিন যে সংশয় দোলা দিচ্ছিল, এখন তার নিরসন হলো। তাঁরা উপলব্ধি করলেন—আইনষ্টাইনের মতো বিজ্ঞানী যাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁকে অবহেলা করলে মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া হবে, বরং তাঁকে বিদেশে পাঠালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামই বৃদ্ধি পাবে। তাই তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের ইউরোপ গমনের অর্থ মঞ্জুর করে দিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্য লাভ করে সত্যেন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে ইউরোপ যাত্রা করলেন। দু বছরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর অর্থ-সাহায্য বরাদ্দ করেন।

ইউরোপে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম নামলেন ফ্রান্সে অর্থাৎ প্যারিসে। এখানে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হলো। অধ্যাপক লেভি তখনও পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে আসেন নি, তবে ফ্রান্স-প্রবাসী অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এঁদের মধ্যে একজন হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসু (বর্তমানে বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ)। এই পরিচয়ের সূত্রেই সত্যেন্দ্রনাথেরও সঙ্গে অধ্যাপক লেভির ঘনিষ্ঠতা হয়।

অধ্যাপক লেভির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দেখা করলেন বিশ্ববিশ্রুতা মাদাম কুরীর সঙ্গে। কুরী তখন বৃদ্ধা।

প্রথম সাক্ষাতেই কুরী তাঁকে বললেন, তিনি যদি তাঁর (কুরীর) সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা করে থাকেন, তা হলে সবপ্রথম তাঁকে ফরাসী ভাষা শিখে নিতে হবে। কারণ তা না হলে তাঁর কথা সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পারবেন না, ফলে কাজের ভীষণ অসুবিধা হবে। ইতিপূর্বে একজন ফরাসী-অজানা ভারতীয় ছাত্রকে তার গবেষণাগারে কাজ করার অনুমতি দিয়ে কুরীকে বিশেষ বিব্রত হতে হয়েছিল। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি মন্থন করেই বোধ হয় তিনি এ কথা সত্যেন্দ্রনাথকে শোনালেন।

সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু ইতিপূর্বেই ফরাসী ভাষায় রপ্ত হয়েছিলেন। অথচ সে কথাটা মাদাম কুরীকে জানাবার সুযোগই তিনি পেলেন না, কুরী এমনই একটানা কথা বলে যেতে লাগলেন। পরে অবশ্য কুরী সত্যেন্দ্রনাথের ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। মাদাম কুরীর ইনষ্টিটিউট অফ রেডিয়ম-এ সত্যেন্দ্রনাথ কিছুকাল তেজস্ক্রিয়া (radio-activity) সম্পর্কে গবেষণা করেন।

প্যারিসে সত্যেন্দ্রনাথ ছয় মাস ছিলেন। এই সময় তিনি খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী দ্য ব্রোয়ীর (De Broglie) গবেষণাগারে একস্ রশ্মি (X-ray) সম্পর্কে কিছুকাল কাজ করেছিলেন। ফ্রান্সে থাকাকালে বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ লাঁজভ্যাঁর (Langevin) সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ তিনি পান।

ফ্রান্সে ছয় মাস অবস্থানের পর সত্যেন্দ্রনাথ আসেন জার্মানীতে। বার্লিনে এসে আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। বার্লিন হোটেল থেকে টেলিফোনে আইনষ্টাইনকে জানালেন, তিনি এসে পৌচেছেন এবং তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। আইনষ্টাইন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সাক্ষাতের সময় থেকে তাঁদের দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্যের সমতুল যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় তা আইনষ্টাইনের মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হত ফরাসী ভাষায়। আইনষ্টাইন নিজে জার্মান হলেও ফরাসী ভাষায় কথা বলতেন এবং লিখতেনও ভালো।

আইনষ্টাইনের দৌলতে সত্যেন্দ্রনাথ জার্মানীতে অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর

সঙ্গে পরিচিত হবার ও অনেক কিছু দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। আইনষ্টাইন তাঁকে তাঁদের আলোচনা-চক্রের সদস্য করে নেন এবং এখানে হাইসেনবার্গ (Heisenberg) প্রমুখ প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করবার সুযোগ পান। এ ছাড়া যে সব জায়গায় সাধারণের এবং বিশেষ করে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ, এমন অনেক সরকারী দপ্তরের ভেতরে গিয়ে তিনি দেখে এসেছিলেন আইনষ্টাইনের দেওয়া পরিচয়পত্রের জোরে। শুধু কি তাই! এই পত্র দেখিয়ে সেখানকার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেও তিনি যখন তখন যে বই দরকার তা নিয়ে আসতে পারতেন, তার জন্যে কোনোরকম টাকাপয়সা জমা রাখবার দরকার হয় নি।

বার্লিনে থাকাকালে সত্যেন্দ্রনাথ আইনষ্টাইনের ৫ নং 'হ্যাবারল্যাণ্ড স্ট্রাসে'র বাড়িতে একাধিকবার গিয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ও অন্যান্য নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পান। প্রথম সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন —"তাঁর সঙ্গে প্রথম যখন দেখা করতে যাই, ঘরে ঢুকে দেখলুম তাঁর টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত বই ও কাগজপত্র রয়েছে এবং এক কোণে রয়েছে তাঁর প্রিয় বেহালাখানি।"

আইনষ্টাইনের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ যদিও সাধারণ অর্থে উচ্চ পদার্থবিদ্যা শিক্ষার বা গবেষণার কোনো পাঠ গ্রহণ করেন নি, তবু একলব্যের মতো তিনি আইনষ্টাইনকে গুরুরূপে মনে মনে বরণ করেছিলেন। আইনষ্টাইন সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা যে কত গভীর ও নীরব তার পরিচয় পাওয়া যায় আইনষ্টাইনের তিরোধান সংবাদ যেদিন এলো। সেদিন দেখা গেল, প্রিয়জন বিয়োগে ব্যথিত সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর একটি অতি মূল্যবান গবেষণা-নিবন্ধ (যা তিনি আইনষ্টাইনের তৎকালীন একক ক্ষেত্র তত্ত্ব বা Unified Field Theory-র দোষত্রুটি দেখিয়ে নিজের মতবাদের সমর্থনে রচনা করেছিলেন) টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে অকেজো কাগজপত্রের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন।

১৯২৬ সাল। সত্যেন্দ্রনাথ তখন জার্মানীতে। এমন সময় ঢাকা থেকে ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বন্ধুরা তাঁকে চিঠি লিখে পাঠালেন, তিনি যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকপদের জন্যে একটি আবেদনপত্র পাঠান

বন্ধুরা আরও জানালেন, আইনষ্টাইনের কাছ থেকে একটি প্রশংসাপত্র জোগাড় করে এইসঙ্গে যেন পাঠান।

আইনষ্টাইনের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ যখন এই ব্যাপারটা সসংকোচে উত্থাপন করলেন তিনি তখন সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "তুমি বিজ্ঞানের যে কাজ করেছ সেটাই কি যথেষ্ট সার্টিফিকেট নয়?" পরে অবশ্য তিনি একটি সার্টিফিকেট লিখে দেন। শুনেছি, এই প্রশংসাপত্রে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আইনষ্টাইন লিখেছিলেন—"We have been benefited by his presence".

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক-পদে প্রথমে ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই কাজে যোগদান করেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথই এই পদে নিযুক্ত হন।

১৯২৭ সালে স্বদেশে ফিরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক-পদে যোগদান করলেন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি বিজ্ঞান বিভাগের ডীন (Dean) নির্বাচিত হন। তাঁর অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ আশাতীত উন্নতি লাভ করে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং নানা বিষয়ে উন্নত ধরনের গবেষণা চলতে থাকে। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ডঃ কে এস কৃষ্ণান, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ডঃ সুশোভন সরকার, ডঃ সর্বাণীসহায় গুহ সরকার প্রমুখ বহু কৃতী অধ্যাপক ছিলেন শিক্ষকমণ্ডলীতে। সত্যেন্দ্রনাথ অধ্যাপক ও ডীন উভয় কাজের দায়িত্ব যেভাবে সম্পাদন করেছিলেন তাতে ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেন। এরপর তাঁর উপর আর একটি কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়—সেটি হলো ঢাকা হলের প্রভোস্ট বা সর্বাধ্যক্ষত্ব। অল্পসময়ের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। এইভাবে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনা করার পর চলে আসেন কলকাতায়।

ঢাকায় অধ্যাপনাকালে ১৯২৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান

কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিপদে এবং ১৯৪৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনে মূল সভাপতি-পদে বৃত হন।

১৯৪৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা থেকে চলে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে তিনি অনেক বছর অধ্যক্ষতা করেন। স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডীন পদেও তিনি কয়েক বছর আসীন ছিলেন এবং বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কার্য পরিচালনা করেছিলেন।

শিক্ষকরূপে সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি গতানুগতিকভাবে পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস মেনে ছাত্রছাত্রীদের কোনোদিন শিক্ষা দিতেন না। সত্যসন্ধানী সত্যেন্দ্রনাথ চাইতেন—তাঁর ছাত্রছাত্রীরা তাদের জ্ঞানের পরিধি শুধুমাত্র পুস্তকের গণ্ডীর মধ্যেই যেন সীমিত না রাখে। তিনি তাদের মনে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিতেন, যাতে তারা কেতাবী রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তহীন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের প্রেরণা পায়।

শিক্ষাদানকালে তাঁর আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যেত—প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে তিনি যেন একটা সমন্বয় দেখতে পেতেন। তাই এক বিষয় পড়াতে পড়াতে তিনি চলে যেতেন বিষয়ান্তরে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যের মাঝে যে একটা ঐক্যের অদৃশ্য গ্রন্থি জড়িয়ে রয়েছে—তারই সন্ধান যেন ছাত্রছাত্রীদের তিনি দিতে চাইতেন।

কলকাতায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাতেই পদার্থ বিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয় ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতেন। অতি জটিল বিষয়গুলিও তিনি বাংলায় এমন সরল ও সহজ ভাবে ব্যক্ত করতেন যে তা ছাত্রছাত্রীদের মর্মে গিয়ে স্পর্শ করত। যে জটিল তত্ত্বকথা অত্যন্ত নীরস বলে ছাত্রছাত্রীদের সাধারণত মনে হয়, তা তাঁর মাতৃভাষায় আলোচনার প্রসাদগুণে প্রাঞ্জল ও সরস হয়ে উঠত। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা একদিকে যেমন বিষয়বস্তু না বুঝে পরকীয়া ভাষায় মুখস্থ করার বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পেত, অপর দিকে

তেমনি উপলব্ধি করতে পারত বাংলা ভাষায় এমন সম্পদ আছে যার মাধ্যমে উচ্চ স্তরের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করাও সম্ভব।

শিক্ষকরূপে সত্যেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও জটিল বিষয়ের প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ তাঁর ছাত্রছাত্রীদের যেমন মুগ্ধ করত, তেমনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের মাঝে একটি কোমল অনুভূতিশীল হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে তারা অভিভূত হত। তাঁর কাছে তারা যে শুধু ছাত্রছাত্রী তা নয়, প্রত্যেকেই যেন তাঁর অত্যন্ত আপনজনের একজন। তিনি নিজের থেকেই প্রত্যেকের পারিবারিক জীবনের খোঁজখবর নিতেন। নিজে অসামান্য হলেও তিনি এসেছিলেন একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, তাই ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যজীবনের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি ছিলেন সমবেদনশীল। ছাত্রছাত্রীদের সর্বপ্রকার সহায়তা করতে তিনি সব সময় এগিয়ে আসতেন। ছাত্র হিসাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কেউ কোনোদিন বিফল মনোরথ হয়েছেন বলে শুনি নি।

গবেষক ছাত্রছাত্রীদের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানরাজ্যের রত্নাকর। জ্ঞানরাজ্যের সকল রত্নের সন্ধান মেলে তাঁর কাছে—বিশ্বপ্রকৃতির সকল রহস্য সমাধানে তিনি সহায়ক। বিজ্ঞানের কোনো একটি চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের অপর একটি চিন্তাধারার সংমিশ্রণে চিন্তাজগতে নতুন আলোকের সন্ধান পাওয়া যায়—যা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে সম্ভব করে তোলে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও সম্যক পরিচিতি যাঁদের আছে তাঁরাই প্রকৃত বিজ্ঞানী—সত্যেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের অন্যতম। তাই বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক থাকাকালে তাঁকে যেমন দেখা গেছে অসীম আগ্রহ নিয়ে গণিত গবেষককে সহায়তা করতে, তেমনি আবার রসায়ন গবেষণায় নিরত ছাত্রের সঙ্গে গবেষণাগারের কাজে লিপ্ত থাকতে। আবার দেখা গেছে, উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সঙ্গে সাগ্রহ আলোচনায় তিনি ব্যাপৃত রয়েছেন। এদিকে আবার পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের উপদেশদানের বিষয়ে ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি সমআগ্রহশীল। আবার গণিতের দুরূহ সমস্যা সমাধানে তিনি যখন আত্মস্থ থাকতেন, তখন মনে হত গণিতই

বুঝি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। বস্তুত, সত্যেন্দ্রনাথের মতো বিজ্ঞানের এত বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক ও গভীর পরিচিতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না।

ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তারে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন সচেতন, তেমনি ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ আগ্রহশীল। তাই অধ্যাপনাকালে হাতেকলমে যন্ত্রপাতি তৈরী করার দিকে তাঁর প্রবল উৎসাহ দেখা যেত। যন্ত্রপাতি নির্মাণে ছাত্রছাত্রীদের যাতে উৎসাহিত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তাঁর কাযকালে স্নাতকোত্তর পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম তিনি কিছুটা অদলবদল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নি। তবে তাঁর অধীনস্থ গবেষক ছাত্রছাত্রীদের এ ব্যাপাবে উৎসাহী করে তুলতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি চাইতেন—গবেষক ছাত্রছাত্রীরা যেন তাদের যন্ত্রপাতি নিজেরাই পরিকল্পনা করে নিজেদের কারুশালায় তৈরী করে নেয়। যা ছাত্রছাত্রীরা একটু মাথা ঘামিয়ে ও পরিশ্রম করে নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে তার জন্যে অপরের দ্বারস্থ হওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলতেন—এভাবে তারা কাজ করলে তাদের নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশ লাভ করবে নিত্যনতুন যন্ত্র আবিষ্কারে। আর এই একই কারণে তিনি বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কেনাব বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না।

এই ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের আর একটি দিক প্রস্ফুটিত—সেটি হলো তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ। যারা দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে তারা যাতে আগে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে—সেটাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি বলতেন—বিদেশে তাদের মতো ছাত্রছাত্রীরা যদি সব দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তবে এদেশের ছেলেমেয়েরাই বা পারবে না কেন? নৈরাশ্যে ভেঙে না পড়ে এদেশের ছেলেমেয়েদের শুধু চেষ্টা করে যেতে হবে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই হবে তাদের প্রচেষ্টার পাথেয়।

এইভাবে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে সম্মানের সঙ্গে খয়রা অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর অবসর গ্রহণ করেন।

এর কিছুকাল পরে বিশ্বভারতীর তদনীন্তন উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আমন্ত্রণ এলো উক্ত পদ গ্রহণের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও পরলোকগত বন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজ পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ এই পদ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে ও ছাত্রদের কারো কারো মনে একটা সংশয় জেগেছিল— সত্যেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে না গেলেই বুঝি ভালো করতেন। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, বিশ্বভারতীতে তখন দল-উপদলের মধ্যে ক্ষমতা দখলের যে লড়াই চলেছিল, সে আবিলতার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের মতো ক্ষমতানিস্পৃহ সত্যনিষ্ঠ লোকের পক্ষে সব দিক সামলে চলা হয়তো সম্ভব হবে না। পরবর্তী কালের ঘটনায় দেখা গিয়েছিল, এই সংশয়ই সত্যে পরিণত হয়েছিল এবং সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে শান্তিনিকেতনে যাওয়া সুখকর হয় নি। তবে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যতদিন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন ততদিন এর নানা বিভাগে তিনি বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তাঁর কার্যকালে বিশ্বভারতীতে সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকাকালে আর একটি কার্যধারা তাঁর মনে বিশেষ ক্ষোভ ও বেদনা সঞ্চার করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পুণ্য হস্তের স্পর্শে এবং যাকে ঘিরে তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা রূপায়ণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার পঠনপাঠনের মাধ্যম হবে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত বাংলা ভাষা। কিন্তু ভারত সরকার বিশ্বভারতীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করার পর থেকে দেখা গেল, বাংলার পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য সেখানে ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করছে। সত্যেন্দ্রনাথ এতে গভীর মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর মতে এতে বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়েছিল।

১৯৫৯ সালে ভারত সরকার সত্যেন্দ্রনাথকে জাতীয় অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। নানা স্থানে ঘোরাঘুরির পর এতদিনে তাঁর মনের মতো কাজ পেলেন। তাই এই নিয়োগে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ছাত্ররা যেমন স্বস্তি ও আনন্দ লাভ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও তেমনি পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন। তাই

প্রসঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীদিলীপকুমার রায়কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"আমার ঘোরার বিরাম হ'ল হয়ত। পাঁচ বৎসরের জন্যে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে মনে একটা আত্মপ্রসাদ জেগেছে—যাক্, এতদিনে দেশ-মাতা রেহাই দিয়েছেন, নিজের কাজ নিয়েই এবার মেতে থাকতে পারবো।"

জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগেই নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন এবং আজও বিজ্ঞান কলেজের মূল ভবনের একতলায় তাঁর ঘরটিতে স্বীয় গবেষণার কাজে ব্যাপৃত আছেন। তবে শুধু তাঁর নিজের গবেষণা নয়, দেশের নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রকল্পে ও বিজ্ঞান প্রগতির নানা কাজে তাঁকে যোগদান করতে হয় এবং তাঁর অভিমত জানাতে হয়। এ ছাড়া, বিজ্ঞান সংক্রান্ত আরও কত শত ব্যাপারে কত জন ও কত প্রতিষ্ঠান যে তাঁর কাছে আসে তার হিসাবনিকাশ নেই।

সত্যেন্দ্রনাথের গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবন নানা সম্মাননায় সমাদৃত। কিন্তু আত্ম-উদাসীন সত্যেন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিন কোনো সম্মানের জন্যে উদ্যোগী বা উন্মুখ হন নি। শুধুমাত্র এম এস সি ডিগ্রী নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করা হয়। এবং ইতিপূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইম্যারিটাস প্রফেসর (Emeritus Prosessor) পদে নির্বাচন করেন। ঐ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন। এরপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে ডক্টরেট ও দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬২ সালে ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দির (Indian Statistical Institute) এবং সম্প্রতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেছেন।

দেশবিদেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃকও সত্যেন্দ্রনাথ সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি-পদে বৃত করেনার পূর্বে তিনি জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার (National Institute of

Sciences) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন এবং ১৯৪৮-৫০ সালে প্রায় তিন বছর উক্ত সংস্থার সভাপতি ছিলেন।

১৯৫২ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি সত্যেন্দ্রনাথকে রাজ্য সভার সদস্যরূপে মনোনয়ন করেন এবং ১৯৫৪ সালে তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেন।

ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গেও সত্যেন্দ্রনাথ জড়িত। ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরের অন্যতম সহ-সভাপতি, কলিকাতা গণিত সমিতির সভাপতি, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহ-সভাপতি, বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশৈল্পিক গবেষণা সংস্থার (C S I R) সদস্য, ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ তিনি অলঙ্কৃত করেছেন ও করে আছেন।

স্বদেশে যেমন, তেমনি বিদেশেও সত্যেন্দ্রনাথের সম্মাননা ঘটেছে অনেক বিলম্বে। এই বিলম্বের হেতু হয়তো তাঁর নিজের খ্যাতিনিস্পৃহতা ও আত্ম-উদাসীনতা। তাই দেখি সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অবদান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু পূর্বে স্বীকৃত হলেও লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো মনোনীত করেছেন অনেক পরে। ১৯৫৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। সেই বছর ডঃ শিশিরকুমার মিত্রও একই সঙ্গে রয়েল সোসাইটীর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বিদেশী বৈজ্ঞানিক সংস্থার আমন্ত্রণক্রমে ও ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ বহুবার বিদেশে গমন করেছেন। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক পরিগণন কেন্দ্র (International Computation Centre) প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনার জন্যে ইউনেস্কোর (UNESCO—রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা) উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় ভারত থেকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি আমন্ত্রিত হন। সেসময় তিনি প্যারিসে সম্মেলন শেষ হবার পর ইংলণ্ড ও জার্মানী ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন।

১৯৫৩ সালে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের (World Congress for General Disarmament and Peace) আমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথ বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। বুদাপেস্টে থাকাকালীন তিনি ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমন্ত্রণ পান সেসব দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের কাজ পরিদর্শনের জন্যে। বুদাপেস্টে যাবার পথে প্রথমে তিনি জেনেভায় নামেন এবং তারপর প্যারিসে গমন করেন। তখন ফ্রান্সে জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমী (National Academy of Science) এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে তাকে সম্মানিত করেন এবং ফরাসী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্যারিস থেকে কোপেনহেগেন, জুরিখ ও প্রাগে তিনি যান। কোপেনহেগেনের পদার্থবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক নীলস বোর এবং জুরিখে অধ্যাপক ডবলু পাউলির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন।

এক বছর পরে ১৯৫৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রিস্ট্যালো-গ্রাফী সম্মেলনে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৫৫ সালে ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংসদের (Council of National Scientific Research) আমন্ত্রণক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ পুনরায় প্যারিসে গমন করেন। সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন শহরে 'আপেক্ষিকতা-বাদের পঞ্চাশ বছর'পূর্তি উপলক্ষে আহুত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। ৫০ বছর আগে ১৯০৫ সালে এই বার্ন শহরে পেটেণ্ট অফিসে চাকরি-কালীন মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আইনষ্টাইনের যোগদানের কথা ছিল, কিন্তু তার পূর্বেই ১৮ এপ্রিল তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার আকাঙ্ক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে যোগদানে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের 'একক ক্ষেত্র তত্ত্ব' (Unified Field Theory) সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ বিষয়ে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্যে তিনি গভীর প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু আইনষ্টাইনের অসময় প্রয়াণে তাঁর সে প্রত্যাশা অপূর্ণই থেকে গেল।

এরপর ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির (British Asso-

ciation for the Cultivation of Science) আহ্বানে সত্যেন্দ্রনাথ লণ্ডনে তাঁদের বার্ষিক অধিবেশনে এবং ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সভায় যোগদান করেন।

১৯৬২ সালের মে মাসে সুইডেনের অন্তর্গত এস্‌কিলষ্টুনা শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সংসদের প্রস্তুতি কমিটির সম্মেলনে সত্যেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। এরপর সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেছিলেন।

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসের গোড়ায় জাপানের টোকিও শহরে নাগাসাকি ও হিরোশিমার উপর পরমাণু বোমা বর্ষণের স্মরণে 'হিরোশিমা নাগাসাকি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্মেলনে যোগদানের জন্যে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান সমিতি সত্যেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি জাপানে গমন করেন। সম্মেলনে বক্তৃতাদান ছাড়াও বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগতির পরিচয় লাভের জন্যে তিনি নানা স্থান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার পরিদর্শন করেন।

১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আমন্ত্রণে প্রেরিত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ মিশরের কাইরো শহরে গমন করেন। সেখানে তিনি ভারত ও মিশরের প্রাচীন যোগাযোগ, কলকাতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ প্রদানের জন্যেও সত্যেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছেন। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতাদানের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অধ্যাপক বসুর এই ভাষণ শিক্ষিত মহলে ও পত্র-পত্রিকায় বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তাঁর এই মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা আলোচনা হয়।

এরপর ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথ সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণেও তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী

নিয়ে কোনো ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও সত্যেন্দ্রনাথ ভাষণ প্রদান করেছেন। এছাড়া তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতা, ডঃ মেঘনাদ সাহা স্মারক বক্তৃতা, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেছেন।

জাতীয় অধ্যাপক হবার পর নিয়মিত অধ্যাপনা ও বাঁধাধরা কাজের মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও সত্যেন্দ্রনাথ আজও স্বীয় গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন এবং দেশের নানা বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই উপলক্ষে দেশবিদেশে তাঁর গমনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিনি এই প্রবীণ বয়সেও সে আহ্বানে সাড়া দিতে পরাঙ্মুখ হন না সচরাচর।

বৈজ্ঞানিক অবদান

এক সময় ভারত ছিল সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি। তখন দেশদেশান্তর থেকে বহু শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষায় ভারতের তক্ষশিলা, নালন্দা, কাঞ্চী, বিক্রমপুর প্রভৃতি শিক্ষার পীঠস্থানগুলিতে উপনীত হত। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, স্থাপত্যবিদ্যা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখায় ভারতীয় সাধকদের অবদান তখন সমগ্র বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছিল। কণাদ, আর্যভট্ট, নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ বিজ্ঞান-সাধকদের নাম তখন বিশ্ববিশ্রুত।

ভারতের এই গৌরবোজ্জ্বল যুগের পর এলো এমন এক অন্ধকার যুগ যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা হলো নির্বাপিত—তখন শুধু তার্কিক ও নৈয়ায়িক আলোচনায় ভারতবাসীর মন আবিষ্ট। ফলে বিজ্ঞানচর্চার আসর থেকে ভারত হলো স্থানচ্যুত। দাতার আসন থেকে ভারত নেমে এলো গ্রহীতার দলে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দানই শুধু দু হাতে সে গ্রহণ করতে লাগলো, বিজ্ঞান-জগতে নিজস্ব কিছু দান করার যোগ্যতা তার আর ছিল না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যখন তাঁর অনন্যসাধারণ অবদান নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায় উপস্থিত হলেন, তখন থেকে এই অবমাননার যুগের হলো অবসান। আধুনিক বিজ্ঞানযুগে জগদীশচন্দ্রই প্রথম দেখালেন—ভারত ভিক্ষুক নয়, ভারতেরও নিজস্ব কিছু দেবার আছে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানজগতে ভারতের আসন আবার প্রতিষ্ঠিত হলো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এসে সে আসন আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র এসে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার যে স্বর্ণদ্বার খুলে দিলেন, সে পথে অগ্রসর হয়ে পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস রামানুজন, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শিশিরকুমার মিত্র, কে এস কৃষ্ণান, এইচ জে ভাবা, বীরবল সাহানী প্রমুখ প্রতিভাধর বিজ্ঞানসাধকেরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদানে বিজ্ঞান জগতে ভারতের মুখ আরও উজ্জ্বল করলেন।

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান-যুগের একজন পথিকৃৎরূপে সত্যেন্দ্রনাথের নাম

এদেশে সুপরিচিত। কিন্তু কি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের অন্যতমরূপে তিনি স্বীকৃত ও খ্যাত, তা এদেশের অনেকেই সঠিকভাবে জানেন না। তাঁরা এটুকু শুধু জানেন, মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের নামের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হয়ে আছে।

কি কারণে এই সংযুক্তিকরণ তা বলতে গেলে ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত এবং আইনষ্টাইন প্রযুক্ত 'বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' (Bose-Einstein Statistics) বিধি এখানে বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে।

কিন্তু এই সংখ্যায়ন তত্ত্ব জটিল গাণিতিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা সাধারণের বোধগম্য করে তোলা কঠিন। তাই গাণিতিক দিক বাদ দিয়ে সাধারণভাবে এই তত্ত্ব এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

আমরা জানি, বহু ব্যষ্টি মিলে সমষ্টির সৃষ্টি এবং একের বা ব্যষ্টির যা আচরণ, সমষ্টির আচরণ তা থেকে ভিন্ন। এককভাবে আমরা যখন থাকি, তখন আমরা যা কিছু করি তাতে আমাদের ব্যক্তিবিশেষের আচরণই প্রকাশ পায়। কিন্তু কোনো মেলায় বা বৃহৎ জনসমাবেশে যখন লোকেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়, তখন তাতে সমষ্টিরই আচরণ প্রকটিত হয়—ব্যষ্টির নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই যা বলা হলো, আমাদের বায়ুমণ্ডলে বিরাজমান অগণিত গ্যাস-অণুর ক্ষেত্রেও সেকথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বায়ুমণ্ডলে গ্যাস-অণুর যে আচরণ আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষ করি, সেটা তাদের সমষ্টিরই আচরণ।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ম্যাক্স্‌ওয়েল (Maxwell) এবং বোলৎসমান (Boltzmann) গ্যাসের অণুদের গতি ব্যাখ্যার জন্যে সমষ্টিবিধি বা সংখ্যায়নিক পদ্ধতি (Statistical method) প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ তাঁরা বললেন, অগণন গ্যাস-অণুর সমাবেশে প্রত্যেকটি অণুর বিক্ষিপ্ত গতির কথা চিন্তা না করে তাদের সামষ্টিক গতির কথাই চিন্তা করতে হবে। কারণ অগণিত গ্যাস-অণুর যে আচরণ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সেটা তাদের সমষ্টিরই আচরণ, ব্যষ্টির নয়।

এদিকে ১৯০০সালে প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী প্লাঙ্ক (Planck) কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণে বিভিন্ন শক্তির পরিমাপ সম্বন্ধে একটি সূত্র দেন। এই সূত্রে তাঁর

নামানুসারে প্লাঙ্ক সূত্র (Planck's Law) নামে পরিচিত। এই সূত্রে প্লাঙ্ক কল্পনা করেন—বিকিরণে শক্তির পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় কোয়াণ্টা (quanta) বা শক্তিগুচ্ছের মাধ্যমে। প্লাঙ্কের এই কল্পনা 'কোয়াণ্টামবাদ' বা শক্তিকণাবাদ নামে অভিহিত। নিউটনীয় গতিবিদ্যা ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে পদার্থবিদ্যা ইতিপূর্বে গড়ে উঠেছিল তাতে শক্তির পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়—এই ধারণাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হত। সুতরাং প্লাঙ্কের এই বিপরীত ধারণা অর্থাৎ কোয়াণ্টামবাদ পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটালো।

কিন্তু প্লাঙ্ক যেভাবে তাঁর সূত্র প্রমাণ করেন তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একেবারে ত্রুটিশূন্য বা অনাপত্তিজনক ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৪ সালে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ এক অভিনব ও সুসঙ্গত পদ্ধতিতে প্লাঙ্ক সূত্রের প্রমাণ দিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই গবেষণাপত্রটি রচনা করেন। নিবন্ধটি প্রকাশের জন্যে তিনি প্রথমে লণ্ডনের বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকা 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের কাছেও একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন।

ফল হলো অপ্রত্যাশিত। প্রকৃত জহুরী যে তার আসল হীরা চিনতে ভুল হয় না। আইনষ্টাইনও তাঁর পত্রপ্রেরকের গবেষণার সারবত্তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ভুল করলেন না। পত্রপ্রেরক সত্যেন্দ্রনাথ তখন আইনষ্টাইনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু পরিচিত-অপরিচিতের প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে গৌণ, এই গবেষণাটি যে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেটাই তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের এই নিবন্ধটি নিজেই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞান-পত্রিকা 'ট্সাইটশ্রিফট্ ফ্যুর ফিজিক্স'-এ প্রকাশ করতে দিলেন। শুধু তাই নয়, এই গবেষণাপত্রের পাদটীকায় নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে জানালেন—"বোস যেভাবে প্লাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করেছেন তা আমার মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি এখানে যে পন্থা প্রয়োগ করেছেন তার সাহায্যে একটি আদর্শ গ্যাসের কোয়াণ্টামবাদ

পাওয়া যেতে পারে; এটা আমি অন্যত্র দেখাব।" আইনষ্টাইনের কাছে প্রেরিত রচনাটি জার্মান পত্রিকায় অতি শীঘ্র প্রকাশিত হওয়ায় ফিল-ম্যাগ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এটি আর প্রকাশ করেন নি।

বোসের এই গবেষণাপত্রটি 'Plancks Gesetz und Lichtquanten hypothese' (Planck's Law and the Light quantum hypothesis) অর্থাৎ 'প্লাঙ্কের সূত্র ও আলোক কোয়াণ্টাম প্রকল্প' এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। গবেষণাপত্রটি প্রকাশকালে আইনষ্টাইন সত্যেন্দ্রনাথেব পুবো নাম না জানায় শুধুমাত্র বোস বলেই উল্লেখ করেছিলেন।

প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত বিকিরণ সূত্রে আলোক কোযাণ্টা বা ফোটন (photon)-কে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের শক্তি-কোয়াণ্টা হিসাবেই গণ্য করেছিলেন। কিন্তু বোস (সত্যেন্দ্রনাথ) আলোক-কোয়াণ্টাকে বস্তুকণার সমতুল্য গণ্য করে অগ্রসর হলেন। অর্থাৎ ফোটনের তরঙ্গ-চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কণা-চরিত্রেব ভিত্তিতে তিনি প্লাঙ্ক-সূত্রকে উপস্থাপিত করলেন। প্লাঙ্ক সূত্রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি এটিকে সংখ্যায়নিক সমস্যা হিসাবে সমাধান করলেন।

কিন্তু এইভাবে সমাধান করতে গিয়ে বোসকে এক নতুন গণনা-পদ্ধতির সাহায্য নিতে হলো। তৎকালে বস্তুকণার দ্বারা গঠিত গ্যাসের আচরণ ব্যাখ্যায় যে ধরনের সংখ্যায়নিক বিধি প্রয়োগ করা হত, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পন্থায় তিনি অগ্রসর হলেন। তিনি ধরে নিলেন যে, ফোটন সমষ্টির মধ্যে এক ফোটনকে অপর এক ফোটন থেকে পৃথক ভাবা যাবে না। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত সংখ্যায়নিক গতিবিদ্যার সূত্রানুসারে ভাবা হত, প্রতিটি ফোটন পৃথক। কোয়াণ্টাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হত তাদের নিজের নিজের স্থিতি ও ভরবেগের ভিত্তিতে। তৎকালীন প্রচলিত মতানুযায়ী সকলে বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি কোয়াণ্টার স্থিতি ও ভরবেগ একই সময়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে। বোস পৃথক রাস্তায় গিয়ে ভরহীন আলোক-কোয়াণ্টাকে সাধারণ ভরসম্পন্ন বস্তুকণার মতো প্রয়োগ করলেন তাঁর গবেষণায়। এইভাবেই তিনি সরাসরি নতুন করে আবিষ্কার করলেন প্লাঙ্ক-এর বিকিরণ-সূত্র।

বোসের পন্থার অভিনবত্বে ও গুরুত্বে আইনষ্টাইন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এসম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেখালেন, বোসের সংখ্যায়নিক বিধি কত সুদূরপ্রসারী। তিনি এই বিধি প্রয়োগ করলেন পরমাণুর বস্তুকণা দ্বারা সংগঠিত সমষ্টির উপর এবং এর দ্বারা গড়ে তুললেন একক পরমাণুসম্পন্ন গ্যাসের কোয়াণ্টামবাদ। এ কারণে বোস উদ্ভাবিত এবং আইনষ্টাইন প্রযুক্ত এই বিধি 'বোস আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' নামে অভিহিত হয়। আজকের দিনে অবশ্য এই সংখ্যায়ন শুধু 'বোস-সংখ্যায়ন' নামেই উল্লেখিত হয়ে থাকে। এই হলো 'বোস আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' এর ইতিকথা ও মর্মকথা।

সত্যেন্দ্রনাথের মাত্র চার পাতার এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চার পাঁচ মাস ধরে বার্লিনে পদার্থবিদ্যার সাপ্তাহিক সেমিনারে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা নিবন্ধ এবং এ সম্পর্কে আইনষ্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রবন্ধগুলি আলোচিত হয়। পরে সত্যেন্দ্রনাথ যখন জার্মানীতে গিয়ে আইনষ্টাইন এবং প্লাঙ্ক, শ্রোয়েডিংগার (Schroedinger) প্রমুখ অন্যান্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপআলোচনা করেন, তখন এরূপ একটি গুরুত্বপুর্ণ গবেষণাপত্রের রচয়িতা মাত্র ৩০ বছরের একজন যুবক দেখে তাঁদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ আর একটি গবেষণাপত্র পাঠান আইনষ্টাইনের কাছে। এই দ্বিতীয়পত্রে তিনি বোস সংখ্যায়ন নতুনভাবে আলোচনা করে প্রমাণ দেন। এই নিবন্ধটিও আইনষ্টাইন নিজে অনুবাদ করে একই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 'Warmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie' (Heat-Equilibrium in Radiation field in presence of Matter) অর্থাৎ 'পদার্থের উপস্থিতিতে বিকিরণ-ক্ষেত্রে তাপগতিবিদ্যাসম্মত সাম্য' এই শিরোনামায় এবং সত্যেন্দ্রনাথের পুরো নামে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় পুর্বোক্ত জার্মান বিজ্ঞান পত্রিকায়। গাণিতিক আলোচনা ও প্রমাণের দিক থেকে এই গবেষণাপত্রটি অসামান্য, কিন্তু এই নিবন্ধের পাদটীকায় প্রকাশিত আইনষ্টাইনের মন্তব্যের জন্যে এটির প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় নি। পাদটীকায়

আইনষ্টাইন মন্তব্য করেছিলেন, বোসের নিবন্ধের সঙ্গে এক জায়গায় তিনি একমত হতে পারছেন না। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কিন্তু এই দ্বিতীয় নিবন্ধ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর মতে বোস সংখ্যায়ন সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় নিবন্ধটি প্রথম নিবন্ধের চেয়ে অনেক ভালো। তাই আইনষ্টাইনের প্রভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই দ্বিতীয় পত্রের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করায় সত্যেন্দ্রনাথ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়ে ১৯২৬ সালে ইতালীয় পদার্থবিদ ফের্মি (Fermi) এবং ব্রিটিশ পদার্থবিদ ডিরাক (Dirac) বস্তু সমাবেশের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন সংখ্যায়ন গড়ে তোলেন। এই সংখ্যায়ন 'ফের্মি ডিরাক সংখ্যায়ন' নামে অভিহিত হয় (আজকের দিনে এর নাম শুধু ফের্মি সংখ্যায়ন)।

এই দুই নতুন সংখ্যায়নের (বোস এবং ফের্মি) ফলে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। পরবর্তীকালে এই সব সম্ভাবনা পরীক্ষাগারে বাস্তবে রূপায়িত হয়। তখন এই নতুন সংখ্যায়নের যাথার্থ্য প্রমাণিত হলো।

বোস এবং ফের্মি সংখ্যায়ন সৃষ্টির পর আজ প্রায় চার দশক পার হতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে পদার্থবিদ্যার জগতে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বস্তুত এই পরিবর্তন এত গভীর ও ব্যাপক যে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না—পদার্থবিদ্যায় এই রকমের প্রগতি এর আগে আর কখনও দেখা যায় নি।

এই বৈপ্লবিক প্রগতি এনেছে আধুনিক কোয়াণ্টাম গতিবিদ্যা। কিন্তু বোস ও ফের্মি সংখ্যায়ন যখন পরিকল্পিত হয়, তখন পর্যন্ত এই গতিবিদ্যার আবির্ভাব হয় নি। এই গতিবিদ্যায় এসে পরমাণু-কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে পূর্বতন ধারণা পরিবর্তন করেছে। এর ফলে ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল গতিবিদ্যা স্থানচ্যুত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই নব গতিবিদ্যা নিউক্লিয়াস অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধিও ক্রমশ সম্প্রসারিত করেছে।

আধুনিক কোয়াণ্টাম গতিবিদ্যার ফলে বোস সংখ্যায়ন আজ নতুন ও

বিজ্ঞানসম্মত রূপ পরিগ্রহ করেছে। মূলত তা সাধিত হয়েছে প্রখ্যাত পদার্থবিদ পাউলির (Pauli) স্পিন (Spin) সংখ্যায়ন উপপাদ্যের সাহায্যে।

পাউলি উপপাদ্যের বিষয় আলোচনা করার আগে 'স্পিন' বলতে কি বোঝায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—যদিও প্রসঙ্গটি বেশ জটিল। পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মতে পরমাণুসমূহের শক্তিস্তর আছে। শক্তিস্তরের একটি আকৃতি আছে বটে, তবে সাধারণত তা জটিল। পদার্থবিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল যাবত এই শক্তিস্তরের আকৃতি তত্ত্বীয়ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যতদিন তাঁরা বিন্দু-আধান ইলেকট্রন (Point charge electron) অনুকৃতি অর্থাৎ তড়িতাহিত অথচ আকৃতিশূন্য কণার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। শক্তিস্তরের গুণকত্ব ব্যাখ্যার জন্যে তাঁদের ধরে নিতে হলো যে ইলেকট্রনের আচরণ একটি ক্ষুদ্র দণ্ড-চুম্বকের আচরণের মতো। আমরা জানি, যদি কোনো আধান বিন্যাস কোনো অক্ষের উপর আবর্তিত হয়, তা হলে ঘূর্ণন-গতির প্রভাবে তাতে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হবে। ইলেকট্রন যখন তড়িতাহিত কণা, তা হলে ভাবা যেতে পারে যে এটি হচ্ছে তড়িতাহিত একটি অতিক্ষুদ্র গোলকতুল্য। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন স্পষ্টতই দুটিমাত্র দিকে তার অক্ষের উপর আবর্তিত হতে পারে—হয় দক্ষিণাবর্তের দিকে, নয় বামাবর্তের দিকে। স্পিনের মান সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আর একটি অনুমান করতে হয়েছে। নিরীক্ষিত বর্ণালির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে তাঁদের ধরে নিতে হয়েছে যে কোনো নির্দিষ্ট স্পিনের কৌণিক ভরবেগের উপাংশ হবে $\frac{1}{2}h'$ অথবা $-\frac{1}{2}h'$ (যেখানে h' হচ্ছে প্লাঙ্ক ধ্রুবক h বিভক্ত 2π)।

পাউলি উপপাদ্যের আলোচনায় আমরা এবার প্রবৃত্ত হতে পারি। সরলভাবে বলতে গেলে পাউলি উপপাদ্যের মূল বক্তব্য হচ্ছে—প্রতিটি মৌলিক পদার্থকণা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক স্পিনের অধিকারী। দেখা গেছে, আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত স্পিনের সর্বনিম্ন মান হচ্ছে শূন্য (o) এবং সর্বোচ্চ মান একক বা 1। আর এই সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যে একটিমাত্র মান-ই থাকতে পারে এবং সেটি হচ্ছে অর্ধেক বা $\frac{1}{2}$। পাউলি উপপাদ্যের বক্তব্য হলো, শূন্য বা একক মানসম্পন্ন কণাসমষ্টি বোস সংখ্যায়ন মেনে চলবে এবং অর্ধস্পিনসম্পন্ন কণাসমষ্টির ক্ষেত্রে ফের্মি সংখ্যায়ন প্রযোজ্য। আরও বিস্তৃতভাবে বলা

যায়, কোনো নিউক্লিয়াস যদি জোড়সংখ্যক অর্ধস্পিন কণা দ্বারা গঠিত হয়, তা হলে তার স্পিনেব মান হবে পুর্ণ সংখ্যা। সুতরাং এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একই প্রকারের কণা দিয়ে কণাসমষ্টি সংগঠিত হবে এবং তা মেনে চলবে বোস সংখ্যায়ন। অপর পক্ষে অর্ধস্পিনেব সংখ্যা বিজোড় হলে সেক্ষেত্রে কণাসমষ্টিব আচাব-আচরণ নির্ধারিত হবে ফের্মি সংখ্যায়ন দ্বাবা। এই অনুযায়ী বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানে মৌলিক পদার্থকণাসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ কবা হযে থাকে। প্রথম শ্রেণীব পদার্থকণা যারা বোস সংখ্যাযন মেনে চলে, তাদেব নামকবণ হযেছে 'বোসন' (Boson) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীব পদার্থকণা যাবা ফের্মি সংখ্যাযনের অনুগামী তাদেব নাম 'ফের্মিয়ন' (Fermion)।

বোস এবং ফের্মিব কাজের সময তিনটিমাত্র মৌলিক পদার্থ-কণা পদার্থ-বিজ্ঞানে উল্লেখিত হত—ধনাত্মক প্রোটন, ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং আলোক কোয়াণ্টা (কণা) যাব চলতি নাম 'ফোটন'। কিন্তু বিগত ৩৫ বছব ব্যাপী নিউক্লিযাস অঞ্চলেব গবেষণার ফলে বর্তমানে মৌলিক পদার্থকণাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিরিশে (নতুন আবিষ্কৃত কণাদের মধ্যে আছে নিউট্রন, পজিট্রন পাই-মেসন, কে-মেসন, অ্যাণ্টি-প্রোটন ইত্যাদি। এদের মধ্যে ফোটন, আলফা-কণা, ডযটেরন প্রভৃতি বোসন শ্রেণীভুক্ত এবং ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি ফের্মিয়নের দলভুক্ত)।

মৌলিক পদার্থকণাব গবেষণায় যাঁরা আজ ব্যাপৃত আছেন তাঁরা সকলেই দৃঢভাবে বিশ্বাস কবেন, আগামী দিনেব পদার্থবিদেবা মৌলিক কণা সম্বন্ধে যে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পাবেন বটে, তবে মৌলিক পদার্থকণা সম্বন্ধে তাঁদের মতবাদ স্থাপন করতে হবে দুটি শক্ত গাঁথুনির উপর। তার একটি হলো ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী বোস সৃষ্ট সংখ্যায়ন এবং অপরটি হলো ইতালীয় পদার্থবিদ ফের্মি সৃষ্ট সংখ্যায়ন।

আধুনিককালে বোস সংখ্যায়নের প্রয়োগ-ক্ষেত্র আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। পাউলির উপপাদ্য এবং আদর্শ বোস-গ্যাস সম্পর্কে আইনষ্টাইনের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে নিম্ন তাপমানসম্পন্ন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র। ধ্রুপদী গতিবিদ্যার নিয়মানুসারে পরমশূন্য তাপমাত্রায় সকল বস্তুই কঠিন আকার

ধারণ করবে। তাপমাত্রা যত কমতে থাকবে, তাপজনিত পারমাণবিক কম্পনও সেই অনুপাতে কমবে। ফলে পরমশূন্য তাপমাত্রায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সকল পরমাণুই সম্পূর্ণভাবে তাদের গতি হারিয়ে ফেলবে এবং সব বস্তুই রূপান্তরিত হবে কঠিন বস্তুতে।

কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, পরমশূন্য তাপমাত্রায় দুটিমাত্র বস্তু তাদের তারল্য হারায় না। এরা হলো তিন ও চার ভরসম্পন্ন হিলিয়ামের দুটি আইসোটোপ (আইসোটোপ বলতে বোঝায় একই মৌলের বিভিন্ন অনুকৃতি—যাদের রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একরকম, কিন্তু পারমাণবিক ভব ভিন্নতর)। এদের মধ্যে চার ভবসম্পন্ন আইসোটোপটি বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে এবং অপরটি ফেমি সংখ্যায়ন অনুগামী। বিজ্ঞানীরা এই দুই তরল পদার্থের নাম দিয়েছেন কোয়াণ্টাম তরল। দুটি কোয়াণ্টাম তরলের মধ্যে বোস-সংখ্যায়ন অনুগামী আইসোটোপটি এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে এক বিশেষ তারল্য লাভ করে। এই তারল্যকে বলা হয়েছে অতি-তারল্য (Super liquid)। অতি-তরল পদার্থের ধর্ম স্বাভাবিক তরল পদার্থের ধর্মের বিপরীত—যেমন, স্বাভাবিক তরল পদার্থের সান্দ্রতা (viscosity) ও এনট্রপি (entropy) আছে; কিন্তু অতি-তরলে এ দুটি ধর্মের অভাব দেখা যায়।

বোস সংখ্যায়নের এই ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে—যা ভবিষ্যতে হয়তো আরও ব্যাপকতর রূপ নেবে।

বোস সংখ্যায়ন তত্ত্ব উপস্থাপনের প্রায় ৩০ বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথ আর একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ তত্ত্বীয় গবেষণা করেন। সেটি আইনষ্টাইনের দীর্ঘকাল আকাঙ্ক্ষিত একক ক্ষেত্রতত্ত্ব (Unified Field Theory) সম্পর্কে। বোস-সংখ্যায়নের বেলায় আইনষ্টাইন যেমন সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা অনুসরণ করেছিলেন, তেমনি একক ক্ষেত্রতত্ত্বের বেলায় সত্যেন্দ্রনাথ অনুসরণ করেন আইনষ্টাইনের এতৎসম্পর্কিত গবেষণাকে।

সাধারণ অর্থে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব বলতে বোঝায় এমন এক তত্ত্ব যা পদার্থ-বিজ্ঞানের দুই বা ততোধিক তত্ত্বকে একসূত্রে আবদ্ধ করতে পারে এবং উভয় তত্ত্বে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, একক ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকেও সেই একই সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয়া যাবে। এই বিচারে ম্যাকস্‌ওয়েলের তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বকে তড়িৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের একক ক্ষেত্রতত্ত্ব বলা যেতে পারে। তেমনিভাবে আইনষ্টাইনের একক ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রয়াস হলো মহাকর্ষ ক্ষেত্র এবং তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রকে একটিমাত্র ক্ষেত্রতত্ত্বে সূত্রবদ্ধ করা।

আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ উপস্থাপনের পূর্বে নিউটন প্রমুখ পূর্বাচার্যেরা যে পদার্থবিজ্ঞান গড়ে তোলেন তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এই স্বীকার্যের উপর যে দেশকালের ধর্ম ও মান দ্রষ্টানিরপেক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ। নিউটন জড় বস্তুর গতিবৈচিত্র্যের কারণ নির্দেশকল্পে মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর মতানুসারে দুটি জড় বস্তুর মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হোক না কেন, তাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ-শক্তি বিদ্যমান থাকবে। মহাকর্ষসঞ্জাত ওই শক্তির প্রভাব দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে বিপরীত বর্গ অনুপাতে বাড়ে ও কমে।

কোনোরকম যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও জড় বস্তুরা দূর থেকে পরস্পরের উপর কেমন করে প্রভাব বিস্তার করতে পাবে, এটা অনেকের কাছে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষভাগে তাই প্রশ্ন উঠলো আলোক তরঙ্গের উপর দ্রষ্টার গতিবৈশিষ্ট্যের কোনো প্রভাব আছে কিনা। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ও সেই সম্পর্কিত নানাপ্রকার পরীক্ষার ফলে নিউটনীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট অসামঞ্জস্য দেখা গেল। এই অসামঞ্জস্য নিরাকরণের জন্যে আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ প্রবর্তন করেন।

নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানে দুটি দ্রষ্টার মধ্যে (যারা পরস্পরের তুলনায় সমবেগে ধাবিত) কোনোরকম প্রভেদ করা অসম্ভব। তখন পদার্থবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে তড়িৎচৌম্বক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা এইরকম প্রভেদ করা বা কোনো বস্তুর পরম গতি বার করা সম্ভব। কিন্তু মাইকেলসন ও মরলি (Michelson Morley)-র প্রক্রিয়ায় দেখা গেল, আলোর (যা হচ্ছে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ) বা এরকম কোনো বস্তুর পরম গতি বার করা সম্ভব নয়। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন এ দুটি তথ্যকে ভিত্তি করে 'গতিশীল বস্তুর তড়িৎ গতিতত্ত্ব' এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এটিই হচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদের সূচনা, যা 'বিশেষ

আপেক্ষিকতাবাদ' নামে পরিচিত। কিন্তু ১০ বছরের মধ্যে উপলব্ধি করা গেল, এই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ মহাকর্ষ ব্যাখ্যার উপযোগী নয়। ১৯১৫ সালে 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তি' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে আইনষ্টাইন মহাকর্ষবাদের একটি সুন্দর গাণিতিক সমাধান দাখিল করেন। কিন্তু চার পাঁচ বছরের মধ্যেই উপলব্ধি করা গেল, এই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মহাকর্ষ ব্যাখ্যার উপযোগী হলেও তড়িৎচৌম্বক তত্ত্ব আলোচনার উপযোগী নয়।

তখন থেকেই চেষ্টা চলছে এমন একটি আপেক্ষিকতাবাদ সূত্র উদ্ভাবন করা যা হবে মহাকর্ষ ও তড়িৎ চৌম্বক উভয় তত্ত্বই একই সঙ্গে আলোচনার উপযোগী। এই তত্ত্ব একক ক্ষেত্রতত্ত্ব নামে পরিচিত। এই চেষ্টায় আইনষ্টাইন তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশ বছরের সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করেছিলেন এবং ভাইল, শ্রোয়েডিংগার প্রমুখ দিক্‌পাল বিজ্ঞানীরা এই চেষ্টায় যোগ দেন।

কালের গতির সঙ্গে একক ক্ষেত্রতত্ত্বের উপর পদার্থবিজ্ঞানের দাবি আরও বেড়ে গেল। বলা হলো—একক ক্ষেত্র তত্ত্বকে কেবলমাত্র মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের বর্ণনাতেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, তাকে মৌলিক কণাসমূহের আচারআচরণের ব্যাখ্যা দিতে হবে। আইনষ্টাইন চিরদিন আশা পোষণ করেছিলেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের চিন্তাধারা অনুসরণ করেই তিনি সমুদয় বস্তুজগতের আচারআচরণ ব্যাখ্যার পূর্ণ তত্ত্বে উপস্থিত হতে পারবেন।

এখানে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন, যাতে নিউটনীয় ধারণা থেকে এই তত্ত্বের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। নিউটনীয় বলবিদ্যার প্রাথমিক কথা হচ্ছে এই যে, কোন জড়বস্তুর উপর বল (force) প্রযুক্ত না হলে সেটি সরলরেখায় ও সমগতিতে ধাবিত হবে। বল প্রযুক্ত হলে সেটি সরলরেখায় ধাবিত হবে না এবং যদিও বা সেটি সরলরেখায় ধাবিত হয় তবে গতিবেগের সমতা সে হারিয়ে ফেলবে।

পক্ষান্তরে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বল সম্বন্ধে ধারণা করা হয় জ্যামিতি মারফত। কোনো বস্তুখণ্ডের উপর কোনো বল কার্যকরী না হলে তার সময়-স্থানচ্যুতি লেখটি (time displacement curve) হবে একটি সরলরেখা। কিন্তু বস্তুখণ্ডের উপর বল প্রযুক্ত হলে তার লেখটি হবে বক্ররেখা। আবার সময়-স্থানচ্যুতি লেখটি যদি সমতলে অঙ্কিত না হয়ে বক্রতলে অঙ্কিত হয়, তা হলে অন্যান্য সম্ভাবনা এসে পড়বে।

. সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে জ্যামিতিক ক্ষেত্র যা মহাকর্ষ ক্ষেত্রও তা। এই ক্ষেত্র নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজন হয় একপ্রকার সমীকরণ সমষ্টির। এদের বলা হয় ক্ষেত্র সমীকরণ (field equation)। এই ক্ষেত্র সমীকরণ মহাকর্ষ ক্ষেত্র বা জ্যামিতিক ক্ষেত্র উভয়কেই নির্ণয় করে। এবং এই ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বস্তুর অবস্থান থেকেই মহাকর্ষ ক্ষেত্রেব উৎপত্তি। এই বৈশিষ্ট্য নির্ভব কবে বস্তুর ভব, তাব গতিবেগ এবং বস্তুব তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর। শেষোক্ত অনুসঙ্গের হেতু, চলমান তড়িতাহিত বস্তু তাব গতিপথের চাবিদিকে সৃষ্টি করে চলে এক তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্র।

কিন্তু তড়িৎচৌম্বক শক্তি বস্তুভবেব উপর নির্ভবশীল নয়, নির্ভব করে তার তড়িৎ আধানের উপব। কাজেই তড়িতাহিত বস্তুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্যে প্রযোজন তাব আধান ও তাব নিজস্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান। এইখানেই মহাকর্ষ ক্ষেত্রেব সঙ্গে তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্রেব মূল প্রভেদ।

সাধাবণ বিচাবে বলা যায, মহাকষ ক্ষেত্রেব দুটি দিক আছে—একটি পদার্থিক ও অপবটি জ্যামিতিক। কিন্তু তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্রেব একটিমাত্র দিক আছে এবং সেটি হলো পদার্থিক।

তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রও যখন একটি ক্ষেত্র, তখন তাব জ্যামিতিক ব্যাখ্যাও থাকা উচিত। কিন্তু ক্ষেত্রতত্বেব কাঠামোতে বস্তুভব বা বস্তুর গতিবেগ অথবা শক্তির কোনো যথার্থ সংজ্ঞা নেই। এই সব সংজ্ঞার পবিবর্তে এখানে নতুন সংজ্ঞা আবোপিত হয়। বস্তুভরের পবিবর্তে এখানে বিবেচ্য ক্ষেত্রের মান কেমন কবে স্থান থেকে স্থানান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে পবিবর্তিত হয়। এইসঙ্গে আরও বিবেচ্য স্থানকালেব সাথে সাথে ক্ষেত্রের শক্তিশালী অংশটুকুও বা কেমন করে পরিবর্তিত হয়।

মহাকর্ষ ক্ষেত্র ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রেব মধ্যে এই প্রভেদ দূর করার জন্যেই একক ক্ষেত্রতত্ব উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম অগ্রণী হন জার্মানীর হারমান ভেইল (Herman Weyl)। তারপর একে একে আসেন ব্রিটিশ পদার্থবিদ আর্থার এডিংটন (Arthur Eddington), হাঙ্গেরীর কালুজা (Kaluza) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। এঁদের তত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট আলোচনা হয়, কিন্তু কারো তত্বই পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। এরপর মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে এই সমস্যা সমাধানে

আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তিনিও তাঁর আয়ুষ্কালে পুর্ণ মীমাংসায় উপনীত হতে পারেন নি। অবশ্য তাঁর হাতে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

১৯৪৫ সালে আইনষ্টাইন যে নতুন ক্ষেত্রতত্ত্বের অবতারণা করেন তার দুটি সোপানের মধ্যে একটি সোপান ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কেউ আরোহণ করতে পারেন নি। আবোহণের পথে দুর্গম বাধা হচ্ছে এই বিষয়ের শুরুতেই ৬৪টি সহ-সমীকরণ। শ্রোযেডিংগাব প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ এই সোপান আরোহণের চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারেন নি। শ্রোয়েডিংগার তাই বলেছিলেন—এই সমীকরণের সঠিক সমাধান অসম্ভব না হলেও একরকম প্রায় অসাধ্য এবং এইহেতু আসন্ন সমাধানেই সন্তুষ্ট থাকা শ্রেয়।

এই দুরূহ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে ১৯৫২ সালে তিনি ঐ ৬৪টি সহসমীকরণের পরিবর্তে দুটি ভাগে ৪০ ও ২৪টি সমীকরণের সাহায্যে এই সমস্যার অতি সাধারণ ও সম্পূর্ণ সঠিক সমাধান করেন। এই সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি গবেষণাপত্র বিদেশের বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি বিশ্বেব বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। পরে আরও কয়েকটি নিবন্ধে তিনি নিজস্ব ধারণা মতো একক ক্ষেত্রতত্ত্বের রূপ দেন। এই বিষয়ে আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপও হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের এই কাজে আইনষ্টাইন আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথের ধারণা কিভাবে প্রযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে তিনি স্থির-নিশ্চিত হতে পারেন নি। কথা ছিল, আপেক্ষিকতাবাদের ৫০ বছর পুর্তি উপলক্ষে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে বার্নে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁদের মধ্যে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে। কিন্তু এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার আগেই এপ্রিল মাসে আইনষ্টাইনের প্রয়াণ ঘটলো। যেদিন আইনষ্টাইনের তিরোধান সংবাদ এলো, সেদিন দেখা গেল একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে আইনষ্টাইনের তৎকালীন মতবাদের মুলগত ত্রুটি দেখিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ নিজস্ব ধারণামতো যে রূপ দেন সেই সংক্রান্ত কাগজগুলি তিনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। এই কাজটি

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের উপযুক্ত হয় নি বটে, তবে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ (যিনি 'একলব্যের মতো' আইনষ্টাইনকে মনে মনে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন) হয়তো ভেবেছিলেন—যাঁকে ঘিরে এই কাজের অবতারণা তাঁর বিহনে এর কোনো মূল্য নেই। এইভাবে সত্যেন্দ্রনাথের একটি অতি মূল্যবান গবেষণা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেল!

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণার মধ্যে বোস সংখ্যায়ন এবং একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কীয় কাজ দুটি সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও তাঁর মৌলিক গবেষণা আরও বহু বিষয়ে বিস্তৃত। সেসব গবেষণার সম্পূর্ণ ও বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করব।

তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক বসুর প্রথম গবেষণাপত্র ডঃ মেঘনাদ সাহার সহযোগে রচিত এবং সেটি লণ্ডনের বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকা 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত হয়। এই গবেষণাপত্রে তাঁরা গ্যাসের অবস্থা সম্বন্ধে একটি সূত্র দেন যা 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ' নামে পরিচিত। ১৯৩৮ সালে আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের পূর্ণ প্রতিফলন বিষয়ে তাঁর (এবং তাঁর সহযোগীদের) একটি গাণিতিক আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে 'আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের 'গতিপ্রকৃতি' (Tendencies in the Modern Theoretical Physics) সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি সমকলনীয় সমীকরণের সাহায্যে কোয়াণ্টাম গতিবিদ্যার হাইড্রোজেন অণুর সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান প্রকাশ করেন।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে অধ্যাপক বসু 'ধ্রুপদী নিয়তিবাদ এবং কোয়াণ্টাম তত্ত্ব' (The Classical Determinism and the Quantum Theory)-এর জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাতে দেখা যায়, জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে তাঁর মত বোর্-হাইসেনবার্গ গোষ্ঠীর চেয়ে আইনষ্টাইন গোষ্ঠীর নিকটতর। অর্থাৎ হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ (Indeterminism) অনুযায়ী বাহ্য জগৎ ও বস্তুকণা সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞানলাভ করা আমাদের

পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আইনষ্টাইনের মতে এই অনির্দেশ্যবাদ পদার্থবিদ্যার বর্তমান জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাজনিত।

গণিতে অধ্যাপক বসুর প্রথম প্রকাশিত নিবন্ধ 'বস্তুর আভ্যন্তরীণ বল সাম্যের সমীকরণ'। প্রায় একই সময়ে বস্তুর ঘূর্ণন অক্ষ-পথের জ্যামিতি সম্বন্ধে তাঁর আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে 'লরেনজ গ্রুপ' সম্বন্ধে তাঁর একটি সারগর্ভ গবেষণাপত্র এবং কিছু কাল পরে ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসুর সহযোগে 'সোনিন বহুপাদরাশি ও কোয়াণ্টামবাদে তার প্রয়োগ' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর দু-এক বছরের মধ্যে ডঃ সীতেশচন্দ্র করের সহযোগে কোয়াণ্টামবাদের একটি সহজ গাণিতিক সমাধান প্রকাশ করেন। ১৯৩৬ সালে মহলানবীশের (প্রশান্তচন্দ্র) D^2 সংখ্যায়ন সম্পর্কে তাঁর একটি গাণিতিক আলোচনা প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ যদিও মূলত তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্ ও গণিতজ্ঞ, কিন্তু পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানেও তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর পরিচালনাধীনে কেলাসের গঠনপ্রণালী, রামন প্রক্রিয়া, প্রতিপ্রভা ইত্যাদি বিষয়ে বহু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে তাঁর তত্ত্বাবধানে একদল গবেষক ছাত্রছাত্রী একস্-রশ্মি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণা করে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই বিভাগের একস্-রশ্মি বীক্ষণাগারে অভ্রের বাঁকানো পাতলা পাতের সাহায্যে একস্-রশ্মি বর্ণালি বীক্ষণের জন্যে যে অতি সূক্ষ্ম ও সুগ্রাহী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে সমাদর লাভ করেছে। এছাড়া, রামন প্রক্রিয়া যে একস্-রশ্মির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তা অধ্যাপক বসুর বীক্ষণাগারেই প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে তাঁর বীক্ষণাগারের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে বিচ্ছুরিত একস্-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন প্রদর্শন।

তাপজনিত আলোক বিকিরণ (thermo-luminiscence) বিষয়েও অধ্যাপক বসুর পরিচালনাধীনে বহু মূল্যবান গবেষণা হয়। এই বিষয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, আলোক বিকিরণের দীপ্তিরেখা যদি টানা যায় তা হলে তাদের তরঙ্গচিত্রে উচ্চ শিখরের অবস্থান দেখা যাবে এবং এই উচ্চ শিখরেরা

তাদের বিকিরণের বর্ণালিচরিত্রে একে অন্য থেকে পৃথক হবে। বর্ণালি-লেখ যন্ত্রের সাহায্যে এই দীপ্তি-শিখরের বর্ণালি পরিমাপের নানা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এই কারণে যে, এই সকল শিখর অতি ক্ষণস্থায়ী এবং তাদের পরিমাত্রাও অত্যন্ত দুর্বল। অধ্যাপক বসু এই সমস্যা সমাধানকল্পে এমন এক বর্ণালি-ফটোমিটার উদ্ভাবন করেন, যাতে শিখরের স্বল্পস্থায়ী জীবন দ্রুত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

অধ্যাপক বসু উদ্ভাবিত এই যন্ত্রটি বিদেশের কয়েকটি নামকরা বীক্ষণাগারে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে এর আরও উন্নতি সাধন করে এই বিষয়ক কাজ দ্রুত এগিয়ে গেছে।

১৯৫৪ সালে প্যারিসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্ফটিক তত্ত্ব সম্মেলনে (International Crystallographic Conferencc) আহূত হয়ে অধ্যাপক বসু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সমক্ষে এই যন্ত্রের পরিচয় দেন এবং এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে তাঁর তত্ত্বাবধানে একস্‌ রশ্মির সাহায্যে সর্পগন্ধাজাত একটি উপক্ষারের স্ফটিকের আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী সম্পর্কে যে গবেষণা কাজ হয়, তার তথ্যও সম্মেলনে তিনি পেশ করেন।

পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপক বসুর আগ্রহ ও অবদানের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁর কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজের কথা উল্লেখ করা হলো। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এতদ্‌বিষয়ক অবদান শুধু উল্লিখিত কাজের মধ্যেই সীমিত নয়, এবিষয়ে তাঁর আরও বহু কাজ আছে। যেমন একস্‌-রশ্মির সাহায্যে তেজস্ক্রিয় ও বিরলমৃত্তিক খনিজের বিশ্লেষণ এবং পৃথিবীর বয়স নির্ণয় ইত্যাদি।

অধুনা বিজ্ঞান এত শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা এত পল্লবিত যে, একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে সকল বিষয়ে আগ্রহ বজায় রাখা অথবা সেসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া অতীব দুরূহ। তাই আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার প্রাবল্য দেখা যায়। এক বিষয়ে যিনি পারদর্শী সেই বিষয় নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে চান এবং অপর কোনো বিষয়ে মাথা ঘামাতে সচরাচর আগ্রহী বা রাজী হন না। কিন্তু কয়েকজন এমন বিরল

বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ অনুভব করেন এবং প্রয়োজনবোধে সেই সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানে মাথা ঘামাতেও কুণ্ঠিত হন না। সত্যেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীবই বিজ্ঞানী। তাই গণিত বা পদার্থবিজ্ঞান যেমন তাঁর মনে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করে, তেমনি রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি অপবাপর বিজ্ঞান-শাখাও তাঁকে সমভাবে আকর্ষণ করে।

জৈব রসায়নবিদ্যায় অধ্যাপক বসুব আগ্রহ ও পাণ্ডিত্যের কথা সুবিদিত। পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় তাঁর প্রতিভাব উজ্জ্বল পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় পরীক্ষামুলক রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রেও। ঢাকায় অধ্যাপনা-কালে তিনি জৈব রসায়নের পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিয়মিত রত থাকতেন। ডঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ভিটামিন-সি বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড সংক্রান্ত গবেষণায়, ডঃ নির্মলকুমার সেন পাটবীজের তিক্ততা সংক্রান্ত গবেষণায এবং ডঃ পুলিনবিহারী সরকাব পাটের ব্যবহারিক সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণায় অধ্যাপক বসুর কাছ থেকে মুল্যবান পথনির্দেশ পেয়েছিলেন বলে শুনেছি। সালফোনা-মাইড অণুর আভ্যন্তবীণ গঠন সংক্রান্ত একটি রাসায়নিক প্রণালী তিনি এমনভাবে সমাধান করেন যে, সেই পদ্ধতিতে একটি ভেষজ যৌগিক প্রস্তুত করা সম্ভব হয় এবং কলকাতাব একটি খ্যাতনামা ভেষজপ্রতিষ্ঠান 'আই-ড্রপস'-এ সেটি ব্যবহার কবে বাজারে চালু করেছেন।

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজেও অধ্যাপক বসুর তত্ত্বাবধানে জৈব রসায়নের সাংশ্লেষিক দিকে বহু মূল্যবান গবেষণা হয়েছে এবং তাঁর অধীনস্থ গবেষক-কর্মীরা বহু মৌলিক গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেছেন।

আমার এক আত্মীয়ের পরিচিত একজন রাসায়নিক ব্যবসায়ী কর্পূরের কেলাস প্রস্তুতের সমস্যায় বিব্রত হয়ে একবার অধ্যাপক বসুর শরণাপন্ন হন। তাঁর সমস্যা ছিল একেবারে বর্ণহীন বা শাদা কর্পূরকেলাস প্রস্তুত করা। তিনি যে পদ্ধতিতে এই কেলাস প্রস্তুত করেছিলেন তাতে সম্পূর্ণ বর্ণহীন কর্পূর-কেলাস পাচ্ছিলেন না, একটু হলদে রঙের কেলাস পাওয়া যাচ্ছিল। এই সমস্যা নিরসনের জন্যে তিনি একাধিক রসায়নবিদের কাছে গিয়েছিলেন,

কিন্তু তাঁদের কারো নির্দেশিত পথে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় নি। অবশেষে তিনি যখন অধ্যাপক বসুর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর সমস্যার কথা জানালেন, তখন অধ্যাপক বসু তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি সবিস্তারে জানার পর যে সংশোধিত পন্থা নির্দেশ করেন তা অনুসরণ করে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী তখন বলেছিলেন—পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক বসুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা এতদিন শুনে এসেছিলুম, কিন্তু রসায়নশাস্ত্রেও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখে বিস্মিত হয়েছি।

শুধু রসায়নবিদ্যা কেন, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও অধ্যাপক বসুর কৌতূহল ও আগ্রহ কম নয়। বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ সহায়রাম বসুর কাছে শুনেছি, তিনি অনেক সময় ছত্রাক সম্বন্ধে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে আলোচনা করে অনেক বিষয়ে নতুন আলোক পেয়েছেন।

খ্যাতনামা ভেষজবিজ্ঞানী ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, অ্যামিবাজাত রোগ প্রতিষেধক সংশ্লেষিত ভেষজের ব্যাপারে তিনি অধ্যাপক বসুর কাছে রাসায়নিক গঠন ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ধারণা এবং প্রাণলীলায় কোষ-এককের কার্যকলাপের রহস্য উদ্‌ঘাটনে নতুন আলোক পেয়েছেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের জীব-পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ সংগঠনে অধ্যাপক বসুর কাছে অনেক মূল্যবান নির্দেশও লাভ করেছেন।

বিশিষ্ট প্রাণীতত্ত্ববিদ ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, নৃতত্ত্ববিদ ডঃ নির্মলকুমার বসু এবং পুরাতত্ত্ববিদ শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেবের কাছেও শুনেছি, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের নানা সমস্যায় অধ্যাপক বসুর কাছ থেকে সুচিন্তিত পথনির্দেশ পেয়ে বিশেষ লাভবান হয়েছেন।

এই সব বিষয়ের গবেষক-কর্মীরা যখনই কোনো সমস্যা-সমাধানে বিব্রত হয়ে অধ্যাপক বসুর শরণাপন্ন হন, তিনি তখন পরম আগ্রহে বিষয়টির প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধা দিয়ে সেই সমস্যা বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে নতুন আলোকপাত করেন—যার ফলে গবেষক কর্মীরা তাঁদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পান। কতজন যে এভাবে উপকৃত হয়েছেন তা লেখাজোখা নেই! কত সময় দেখেছি, অধ্যাপক বসু নিজের

কাজ রেখে অপরের সমস্যা-সমাধানে দিনের পর দিন মাথা ঘামাচ্ছেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসাধনার এই দিকটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর সর্বজনগ্রাহ্য দলিল প্রমাণ উপস্থিত করা যায় না, কেবল যে সব বিজ্ঞানকর্মী এই উদ্দেশ্যে তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই স্বয়ং এর সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারবেন।

অধ্যাপক বসু বর্তমানে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণারত আছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব, বৃত্তচ্ছেদীয় সমীকরণ, অপরিচিত কণিকার অনুনাদ, কোয়াণ্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের ভিত্তিমূল এবং কণিকা পদার্থবিজ্ঞানে প্রতিসাম্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা।

অধ্যাপক বসুব অধীনে বর্তমানে যে সকল পরীক্ষামূলক গবেষণা হচ্ছে তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো খনিজেব ভূতাত্ত্বিক কাল নির্ণয়ের জন্যে তেজস্ক্রিয় খনিজের একস্‌-রশ্মি অনুপ্রভার বর্ণালি-বীক্ষণ এবং কয়েক শ্রেণীর উপক্ষারের জৈব একক কেলাস-আকৃতি নিরূপণ।

সর্বশেষে সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী জীবনের আর একটি দিক উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁর বিজ্ঞানী-জীবনে একটি স্বভাবধর্ম বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় যে, যা বিজ্ঞানের দিক্‌পালদের উপযোগী নয় অথবা যা বিজ্ঞানের মূলে নতুন আলোকপাত করে না সেরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যা তাঁর মনে তেমন কৌতূহল জাগায় না এবং কোনো কারণে যদিও বা জাগায় তবে তা সমাধান করার পর ছাপার অক্ষরে প্রকাশে তাঁর প্রবল অনীহা। এটাকে সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী-জীবনের একটি বিশেষ ত্রুটি বা মহত্ত্ব যাই বলা যাক না কেন, এটা কিন্তু তাঁর চিরদিনের স্বধর্ম। তাঁর জীবনের অতি অল্প সময়ই তিনি পড়শোনা না করে বা অঙ্ক না কষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন; কিন্তু ছাপার অক্ষরে তাঁর কাজের প্রকাশ খুবই কম। তাঁর চরিত্রের এদিকটা যাঁরা জানেন না, তাঁরা তাঁকে 'অলস বিজ্ঞানী' বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু 'আমারে যেন না করি প্রচার, আমার আপন কাজে'—এ বাণী যাঁর চরিত্রে মূর্ত, তাঁর কানে এ ধরনের সমালোচনার কথা পৌঁছলেও তিনি থাকেন অবিচলিত।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি অনুযোগ কেউ কেউ করে থাকেন—তিনি নাকি

তাঁর বিজ্ঞান-প্রতিভার যথোচিত সদ্ব্যবহার করেন নি এবং বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর কাছে দেশের আরও যা প্রত্যাশা ছিল তা তিনি পূর্ণ করেন নি। এ অনুযোগের উত্তরে এটুকু শুধু বলা যায়, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্যে যে উপযুক্ত পরিবেশ ও অনন্যচিত্ত অবকাশ অপরিহার্য, এদেশে তার একান্ত অসদ্ভাব। এদেশে প্রতিভাসম্পন্ন স্বাধীন মনের সৃজনী কাজের পরিবেশ যদি আরও উপযোগী ও অনুকূল হত, তা হলে সত্যেন্দ্রনাথ হয়তো বিজ্ঞানক্ষেত্রে আরও বেশি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পারতেন। সৃজনী কাজে তাঁর প্রতিভা সদ্ব্যবহারের পূর্ণ অবকাশ তিনি বেশি পাননি, যেমন পেয়ে থাকেন বিদেশের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা। জীবিকা নির্বাহের জন্যে অর্থোপার্জনের কাজে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে—নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার অবকাশ পেলেন একেবারে জীবন সায়াহ্নে। তাঁব নিজের কথায় বলতে গেলে—"মুক্তি এলো যখন, তখন মনীষা অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। আর চোখের জ্যোতিও ক্ষীণ এখন। তবু তো ডাক শুনতেই হবে।" বিজ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রীর ডাকে সত্যেন্দ্রনাথ আজও তাই অনলস ও একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন।

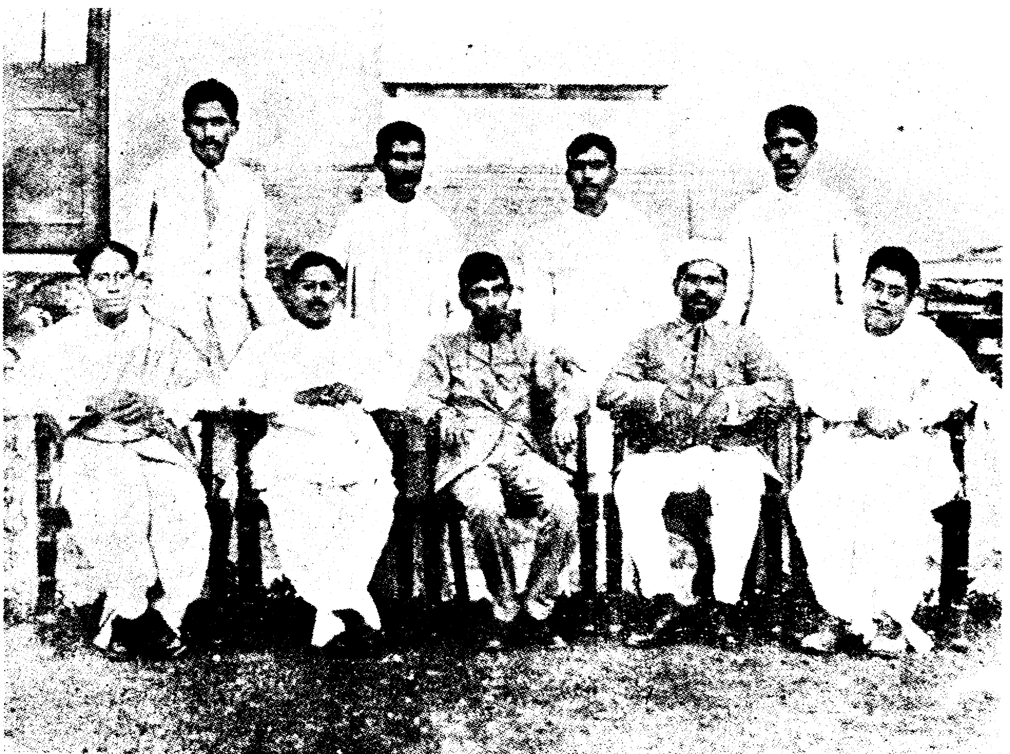
বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ

একজন প্রখ্যাত লাতিন চিন্তাবিদ তাঁর একটি উক্তিতে বলেছেন—"Homo sum , humıni nıl ı me ılienum puto" অর্থাৎ "আমি মানুষ, কাজেই মানুষ সম্পর্কীয় কোনো কিছুর প্রতিই আমি উদাসীন হতে পারি না।"

এই উক্তিটি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। সত্যসন্ধ বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি যেমন বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তার গভীরে প্রবেশ করতে সমুৎসুক, তেমনি সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি মানবীয় সকল বিষয়েরও প্রতি তাঁর প্রবল কৌতূহল ও রসাস্বাদনের গভীর আগ্রহ দেখা যায়। তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন —"সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে সংস্কৃত, ঐতিহাসিকদের সঙ্গে ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, গীতজ্ঞদের সঙ্গে সঙ্গীত, কবিদের সঙ্গে কাব্য—কোনো আলোচনাতেই ও (সত্যেন্দ্রনাথ) পেছপা হত না। আরো আশ্চর্য এই যে, এ সব আলোচনাতে ও শুধু ঔৎসুক্য প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হত না, এমন সব মন্তব্য করত যে বিশেষজ্ঞরাও খুশি না হয়ে পারতেন না।"

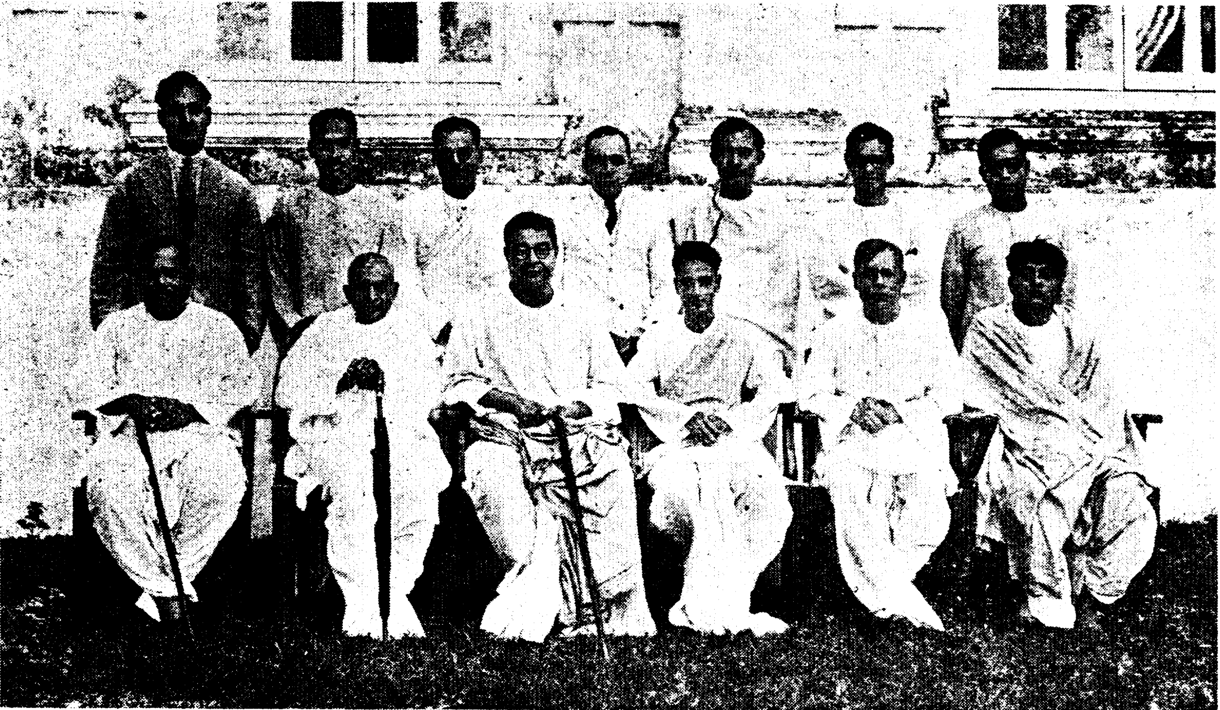
মানবীয় বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের এই আগ্রহ ও অনুরাগ ছাত্রজীবন থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রাঙ্গন পেরিয়ে সাহিত্য ও সঙ্গীতের অঙ্গনে তিনি নিয়মিত আনাগোনা করতেন ছাত্রাবস্থা থেকেই। তাই বিজ্ঞানের রহস্যময় রাজ্যে প্রবেশ করে তাঁর সমস্ত হৃদয়মন যেমন প্রগাঢ় অনুরাগে উদ্দীপ্ত হয়েছিল, তেমনি সেই সঙ্গে তাঁর কানে বেজেছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতের সুমধুর সুরধ্বনি। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানচর্চার সাথে সাথে সাহিত্য ও সঙ্গীতের রসাস্বাদনে তিনি কম উৎসাহ বোধ করতেন না। এমন কি, এন্ট্রাস পরীক্ষায় তিনি মানবীয় বিষয়ে (ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস ইত্যাদি) তিনি এত বেশি নম্বর পেয়েছিলেন যে শোনা যায় তাঁর পিতা নাকি মাধ্যমিক শ্রেণীতে তাঁকে কলাবিভাগে ভর্তি হতে বলেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন ছাত্র, তখন বাংলার সাহিত্যাকাশে দুটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ (১৯১৪-১৫)

উপবিষ্ট (বামদিক থেকে)—পুলিনবিহারী সরকার, অমরেশ চক্রবর্তী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, টি এস মুত্তু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু।
দণ্ডায়মান (বামদিক থেকে)—মেঘনাদ সাহা, উপেন্দ্রনাথ কর্মকার, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।



ঢাকায় 'বারো-জনা'র সদস্যদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ (১৯৩৪)

দণ্ডায়মান (বামদিক থেকে)—মামুদ হোসেন, সর্বাণীসহায় গুহ সরকার, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আর্থার হিউজ, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, হীরেন্দ্রলাল দে, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ।

উপবিষ্ট (বামদিক থেকে)—বিনয়কুমার সেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়,

বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যগগনের মধ্যাহ্নে আর শরৎচন্দ্র তখন উদীয়মান। সত্যেন্দ্রনাথ স্বভাবতই রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর বাংলা সাহিত্যের নতুন দিশারী শরৎচন্দ্র যখন তাঁর 'বড়দিদি'-র অতুলনীয় উপচার নিয়ে দেখা দিলেন, তখন অন্যান্যদের মতো সত্যেন্দ্রনাথও শরৎসাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্যের প্রতি ছাত্রজীবনে তাঁর এই যে আকর্ষণ ও অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল তা পরবর্তীকালে তাঁদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসে আরও নিবিড় হয়।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এই সাহিত্যানুরাগ শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যেই সীমিত ছিল না, তা সাধারণভাবে বিস্তৃত ছিল সমগ্র বাংলাসাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশী সাহিত্যেও। ছাত্রজীবনেই তিনি ফরাসী ভাষায় রপ্ত হন এবং ফরাসী সাহিত্যের একজন উৎসাহী পাঠক ও বোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই প্রবল অনুরাগই তাঁকে প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) 'সবুজপত্রে'র বৈঠকে টেনে এনেছিল। এই সাহিত্যানুরাগের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রীতি এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর চলতি ভাষার প্রচলনের প্রসাদগুণও সত্যেন্দ্রনাথকে সবুজপত্রের আসরের প্রতি আরও আকৃষ্ট করেছিল। অপরপক্ষে প্রমথ চৌধুরীও সত্যেন্দ্রনাথের বিদগ্ধ মনের কথা তাঁর শিষ্য হারীতকৃষ্ণের কাছে শুনে তাঁকে আসরে আহ্বানের জন্যে আগ্রহান্বিত হন।

১৯১৬ সালে নভেম্বর মাসের শেষদিকে হারীতকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় সত্যেন্দ্রনাথ সবুজপত্রের আসরে প্রথম যোগদান করেন। তবে প্রথম সভায় তিনি একাই গিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত অসুবিধার দরুন হারীতকৃষ্ণ সেদিন তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন নি। এই সভার যোগদানের জন্যে প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথকে যে পত্র দিয়েছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সেই আমন্ত্রণপত্রে প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—"শ্রীমান হারীতকৃষ্ণ লিখেছেন যে, নানা কারণে তাঁর পক্ষে কাল (২৫-১১-১৬) বিকেলে এখানে (ব্রাইট স্ট্রীটে প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে) আসার সুবিধে হবে না। তবে আপনি যদি আসেন তো বড় সুখী হব। যাঁরা লেখাপড়া করেছেন

অর্থাৎ মন নামক পদার্থটিব চর্চা করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমি মিশতে কথাবার্তা কইতে ভালবাসি। পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য আমরা সকলেই বই থেকে পেয়েছি, কিন্তু সেই সব বইয়ের কথা প্রতি লোকের ভিতর থেকে অল্পবিস্তর নূতন মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে তা লেখাব কথায় সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পবেব কথা শুনতে এত ভালবাসি। তা ছাডা যাঁবা পডেছেন তাঁদেব আমি লেখাতে চাই। কেননা বাঙ্গলা সাহিত্যে জ্ঞানের দিকটে আজ পর্যন্ত ফাঁক রয়ে গেছে। আর যতদিন বাঙ্গলা সাহিত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার না হবে, ততদিন উঁচুদরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যও আমাদের দু-একটি প্রতিভাশালী লেখকের মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেব লেখা বাদ দিয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন কিছু থাকে না, যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়—তা নিয়ে গৌরব করা ত দূরের কথা। আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য, প্রকৃতির এমন কোন বাঁধা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ ভূ-ভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, একথা শাস্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন লোকদের পক্ষে আমরা যেটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার ভাগ দেশের লোককে দেওয়াটা কর্তব্য। এই কারণেই আমি আপনাকে 'সবুজপত্রে'র আসরে নামাতে চাই।"

প্রমথ চৌধুরীর আহ্বানে সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাইট স্ট্রীটে সবুজপত্রের আসরে এই যে প্রথম যোগদান করেন তারপর থেকে নিয়মিত সে আসরে উপস্থিত থাকতেন। প্রথম পরিচয়েই তিনি প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজ' আসরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর প্রমথ চৌধুরীও বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আরও আগ্রহান্বিত. হন।

এই সবুজপত্রের আসরে হারীতকৃষ্ণ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া আর যাঁরা নিয়মিত যোগদান করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সোমনাথ

মৈত্র, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, মানিকলাল দে, বরদাচরণ গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি।

সবুজপত্র দলের এই মননশীল মজলিশের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি অনুপম লেখায়—"এই মজলিশটি ছিল সাহিত্যিক মনের রসায়ন। বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্যের রচনারীতি স্বভাবত এখানে প্রায়ই আলোচনা হত। কিন্তু আলোচ্য বস্তুর তা ছিল অংশমাত্র। দেশবিদেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দেশী বিদেশী রাষ্ট্রব্যাপার কিছুই বাদ যেত না। সব বিষয়ের অল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞ দু-একজন করে মজলিশে ছিলেন। তবে সব আলোচনায় সকলেই যোগ দিতেন এবং আলোচনার ধারা এমন ছিল অবিশেষজ্ঞের মন ও বুদ্ধি যাতে উৎসুক ও উন্মুখ হয়ে ওঠে। কোন্ বিষয়ে নূতন ভাল বই বেরিয়েছে সে খবর এখানে আদান-প্রদান হত, আর সে পুঁজি সংগ্রহ করে পড়া ছিল অনেক মজলিশির অবশ্য কর্তব্য। বেশির ভাগ বই-এর খবর প্রমথবাবুই দিতেন এবং তিনিই কিনতেন। তাঁর বই মজলিশিদের হাতে হাতে ফিরত। বাঙালি লেখকদের মনের পুঁজি যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির লেখকদের মনের পুঁজির চেয়ে কম হবে না, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি লেখকের মনের যোগ হবে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ—এটা ছিল মজলিশের অকথিত স্বীকৃতি। আর তার আয়োজন ও উপকরণের যোগান এখানে চলত। আলোচনার লক্ষ্য ছিল, এসব বস্তু যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, তার বোঝা না হয়ে ওঠে। বিনা বিচারে কোনও কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড় নামই থাক্ না কেন। 'বাধিতমর্থং বেদোহপি ন বোধয়তি'—তা সে বেদ সংস্কৃতেই লেখা হোক, কি ইংরেজি ফরাসি জার্মান ভাষাতেই লেখা হোক। বলা বাহুল্য বহু বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা ও যাচাই না করে তাকে স্বীকার না করা, এ দুটি ছিল প্রমথবাবুর মনের প্রতিচ্ছবি। মজলিশিদের অল্পবিস্তর সমধর্মী মনে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একদিন দেশের প্রাচীন ভাব-ধারাকে যাচাই করেছিল পাশ্চাত্য ভাবের নূতন আলোকে। সবুজপত্র যুগে প্রয়োজন হয়েছিল এই নূতন ভাবকে যাচাই করার।"

কলকাতায় থাকলে রবীন্দ্রনাথ এই আসরে মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। এই আসরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম পরিচিত হন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় চলতি ভাষায় লেখার যে ধারা প্রচলন করেন তার প্রসাদগুণে সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির তরুণ মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তাঁরা প্রমথ চৌধুরীর ভাষার মুন্সীয়ানায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রমথবাবুকে পুর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন এ বিষয়ে—"সবুজপত্র বাংলা ভাষার মোড ফিরিয়ে দিয়ে গেল।...এর পুর্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে ছিল খিডকির অন্দর মহলে।...একবার যেমনি একে আত্মপ্রকাশের অবকাশ দেওয়া গেছে অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল নিয়ে কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে।"

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চলতি বাংলা ভাষাকে সাহিত্যে কায়েম করা। তিনি নিজে যেমন এ ভাষায় লিখতেন, তেমনি তাঁর সবুজসভার সভ্যদেরও এভাবে লিখতে অনুপ্রাণিত করতেন। বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকটি পরিপুরণের জন্যে তিনি বিশেষ উৎসুক ছিলেন। এজন্যে সত্যেন্দ্রনাথকে সবুজপত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে তিনি বহুবার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সে আশা পুর্ণ করেন নি। হারীতকৃষ্ণকে একটি পত্রে তাই তিনি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অভিমান প্রকাশ করে লিখেছিলেন—"সত্যেন্দ্র সাদা কাগজের উপর কালো আঁচড় কাটেন না, বোধ হয় তার কারণ তিনি কালো বোর্ডের উপর খড়ির সাদা আঁচড় কাটাটাই তাঁর স্বধর্ম বলে স্থির করে নিয়েছেন।"

'সবুজপত্রে' ছাপার অক্ষরে যদিও সত্যেন্দ্রনাথ একটিও প্রবন্ধ লেখেন নি, কিন্তু সবুজপত্রের আসরের আলোচনায় তিনি নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। এমন কি প্রয়োজনবোধে স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের বাদপ্রতিবাদও করতেন নিজস্ব যুক্তি দিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথের এই যুক্তিবাদী মননশীলতার জন্যে চৌধুরী মশাই তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সবুজপত্রের আসরে যোগদান করে বিজ্ঞানসেবী সত্যেন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী মন একদিকে যেমন পরিপুষ্টতা লাভ করেছিল, অপর দিকে তেমনি মননশীল

বন্ধুদের (যাঁরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছিলেন) সাহচর্যে ও তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁর বিদগ্ধ মন মানবীয় বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার প্রশস্ত সুযোগ পেয়েছিল। তারই প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা' আসরেও সত্যেন্দ্রনাথ নিয়মিত যোগদান করতেন। তবে এই আসরে তিনি প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতেন না, শুধু শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকতেন বলে শুনেছি।

পরবর্তীকালে (১৯৩০) বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ আরও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পবিচয' গোষ্ঠীব সঙ্গে। 'সবুজপত্রে'র উত্তর-সাধক হিসাবে 'পবিচয়' পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে এব আত্মপ্রকাশ। এতে গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষযে প্রবন্ধাদি ছাডা থাকত সমালোচনা ও পুস্তকপবিচয। শুধু এদেশীয সাহিত্য ও সংস্কৃতি নয, বিশ্বেব সাহিত্য ও সংস্কৃতির পবিচয় এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রথম বর্ষেব প্রথম সংখ্যায লিখেছিলেন 'বিজ্ঞানেব সংকট' শিরোনামায একটি প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয়টি লিখেছিলেন 'আইনষ্টাইন' সম্পর্কে।

প্রায় পাঁচ বছর কাল এই 'পরিচয়' পত্রিকা ত্রৈমাসিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তাবপর এটি হস্তান্তবিত হয়ে মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হতে থাকে এবং বর্তমানেও প্রকাশিত হচ্ছে। সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে সবুজপত্রের আসবেব মতো পরিচয় গোষ্ঠীবও সাপ্তাহিক আসব বসত নিযমিত। এই আসর সাধাবণত বসত সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতে। সত্যেন্দ্রনাথ এই আসরে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতেন, তবে তিনি তখন ঢাকায় থাকায় তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি ঘটে উঠত না।

এইসঙ্গে ঢাকায় অবস্থানকালে সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহে আর একটি ছোটখাটো বৈঠকী সভা গড়ে ওঠে। সুসাহিত্যিক ও সদস্য শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এই বৈঠকের নাম দেন 'বারো-জনা'। অর্থাৎ বারো জন সদস্য নিয়ে এই বৈঠক গঠিত হয়। এটি ছিল সদস্যদের একটি মিলনভূমি। প্রতি মাসে বারো জন সদস্যের একজনের বাড়িতে সকলে মিলিত হতেন। ঘুরে ঘুরে প্রতি সভ্যের

বাড়িতে এই বৈঠক বসত। প্রায় প্রত্যেক মিলনের দিনেই একজন সদস্যকে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতা করতে হত এবং তারপর সে বিষয়ে আলোচনা হত। আলোচনার আগে বা পরে জলযোগের ব্যবস্থা থাকত। সত্যেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মামুদ হুসেন, আর্থার হিউজ, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বাণীসহায় গুহ সরকার, হীরেন্দ্রলাল দে, ও সুশোভন সরকার ছিলেন 'বারোজনা'র সদস্য। অনেকে অতিথি হিসাবেও বৈঠকে আসতেন। ১৯৩২-৩৫ সাল পর্যন্ত 'বারোজনা'র বৈঠক চলেছিল বলে শোনা যায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগের পরিচয় আরও কতক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে তা বলে শেষ করা যায় না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা সম্মেলনে তাই তাঁর ডাক পড়ে প্রায়ই। ১৯৫৮ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জব্বলপুর অধিবেশনে তিনি মূল সভাপতি পদে বৃত হন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের একাধিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। এছাড়া আরও বহু সাহিত্য আসরে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন এবং আজও করে থাকেন।

সাহিত্য বিষয়ক সম্মেলনে তিনি যে সব ভাষণ দিয়েছেন তাতে তাঁর অন্তরের একটি কথা বিশেষ করে ফুটে ওঠে যে, সাহিত্যকে শুধু কল্পলোকের মনগড়া কাহিনী বিবৃত করলে চললে না, এই মাটির পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষার কথাও সাহিত্যিকদের বলতে হবে এবং তা ব্যক্ত করতে হবে সহজ সরল অন্তরস্পর্শী ভাষায়।

সঙ্গীতের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগ বালককাল থেকেই। ছাত্র জীবনে বন্ধুমহলে তিনি যেমন গান শুনতে ভালবাসতেন, পরিণত বয়সে সে সুরলোকের আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিনি শুধু একজন মর্মজ্ঞ নন, একজন খাঁটি সমজদারও—সুরের এতটুকু বিচ্যুতি তাঁর কান এড়িয়ে যায় না। সঙ্গীতসুধাকর শ্রীদিলীপকুমার রায়ের ভাষায় বলতে গেলে—"গানের সে (সত্যেন) এক খাঁটি সমজদার, ভালো গান শুনবামাত্র এক আঁচড়েই ভালো বলে চিনে নিতে পারত।"

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগরাগিনী সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যে কত নিবিড় তা তাঁর সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করলেই উপলব্ধি করা যায়। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন, তখন তিনি অধ্যাপক বসুর কাছ থেকে এবিষয়ে পরামর্শ ও অভিমত গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথ যদি সঙ্গীতবিদ্যাকে তাঁর বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন, তা হলে তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ বলেই বিবেচিত হতে পারতেন। বস্তুত এই উক্তির মাঝে কোনো অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথ নিজে এস্রাজ বাজান এবং সত্যিসত্যি ভালো বাজান। এবং নিজে নতুন রাগও সৃষ্টি করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'গুরুদেব' আইনষ্টাইনেব কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। আইনষ্টাইন ছিলেন বেহালার উঁচুদরের সাধক। বিজ্ঞানসাধনার অবসরে তিনি যখন তাঁর প্রিয় বেহালাটি তুলে নিয়ে ছড় টানতেন, তখন সুবসাধনাব মর্মলোকে প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যেতেন এবং তাঁর বেহালা থেকে যে সুরমূর্চ্ছনা উঠত তা অভিভূত করত সকল শ্রোতাকে। তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও যখন আপন মনে এস্রাজ বাজান, তখন তিনি যেন এক অন্তলোকের মানুষ হয়ে যান। সুরসাধক সত্যেন্দ্রনাথের সে মূর্তি যিনি দেখেছেন তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন কত মরমী সুরজ্ঞ তিনি। কতবাব তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি—তাঁর প্রিয় এস্রাজটি নিয়ে তিনি আত্মসমাহিত হয়ে বাজাচ্ছেন। সেসময় আমাদের উপস্থিতি যেন তাঁর দৃষ্টি ও মর্মলোকের বাইরে। আমরাও তখন নীরব শ্রোতা হয়ে তাঁর মিষ্টি হাতের সুরধ্বনি শুনতে থাকি। তারপর সুরের শেষে যখন তাঁর তন্ময়তা শিথিল হয়, তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন—"কিরে, কখন এলি?"

ঢাকায় অবস্থানকালে সত্যেন্দ্রনাথের সুরসাধনা সম্পর্কে অধ্যাপক সমর গুহ'র কাছে শুনেছি—"জ্যোৎস্না রাতে অধ্যাপক বসুর হাতে খেলে যেত এস্রাজের ছড়িটি। ফুলে ফুলময় তাঁর ঢাকার রমনার বাড়িতে এই যন্ত্রসঙ্গীত যে শুনেছে এবং বিজ্ঞানাচার্যের শিল্পী আবেগোচ্ছল মূর্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সে কথা ভুলতে পারবেন না। ঢাকাতে প্রতি বছর নামকরা গাইয়ে বাজিয়ে আমন্ত্রিত হতেন। তাঁদের কেউ অধ্যাপক বসুর

বাগানঘেরা আঙিনায় জলসায় উপস্থিত না হয়ে ঢাকা ত্যাগ করতে পারতেন না।”

সত্যেন্দ্রনাথ কত বড় সঙ্গীতপিপাসু তার দু একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যতম পথিকৃৎ ও পৃষ্ঠপোষক ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রতি বছর তাঁদের পাথুরিয়াঘাটার বাসভবনে সঙ্গীতের আসর আয়োজন করে থাকেন। সাধারণত জানুয়াবি মাসে এই আসব আয়োজিত হয়। প্রতি বছর জানুয়ারি মাস এলে সত্যেন্দ্রনাথ এই আসরের খোঁজ নেন এবং মন্মথবাবুও যথাসময়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে ভোলেন না। এই স্মৃতিবাসরে সভাপতি বা প্রধান অতিথিরূপে তিনি একাধিকবার উপস্থিত থেকেছেন। এ ছাড়া, ‘ঝঙ্কার’ সঙ্গীত চক্রের সভাপতিপদেও তিনি আসীন ছিলেন এবং তাঁদের বাষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। বর্তমানে ‘ক্যালকাটা আকাডেমি অফ ইণ্ডিয়ান মিউজিক’ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সভাপতিরূপে তিনি যুক্ত আছেন।

বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি যেমন উপস্থিত থাকেন, তেমনি ছোটখাটো বা ঘরোয়া সঙ্গীতানুষ্ঠানেও যোগ দিতে তাঁব অনুৎসাহ দেখা যায় না। কিশোর কল্যাণ পরিষদ, সব পেয়েছিব আসর প্রভৃতি ছোটদের প্রতিষ্ঠানের বাষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আসরেও তাঁকে উদীয়মান নবীন সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের গানবাজনা শুনতে উপস্থিত হতে দেখা যায়।

১৯৬১ সালে মার্কাস স্কোয়ারে আয়োজিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের রবীন্দ্রশতবার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতিপদে বৃত হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। অধিবেশনেব সমাপ্তি দিনে সাধক সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের ভাষণ ও সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন দিনে উদ্যোক্তারা সত্যেন্দ্রনাথকে সমাদরে অনুষ্ঠানমণ্ডপে নিয়ে তাঁদের কার্য সমাধা করেছিলেন, কিন্তু সমাপ্তি দিনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর বা নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি।

কিন্তু সঙ্গীতপিপাসু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর গান শোনার জন্যে বিনা আমন্ত্রণেই উপস্থিত হলেন অনুষ্ঠানক্ষেত্রে। প্রবেশ পথে স্বেচ্ছাসেবকেরা (যারা সত্যেন্দ্রনাথকে চেনে না) তাঁর পথ রোধ করে প্রবেশপত্র দেখতে চাইলো।

সত্যেন্দ্রনাথ তাদের বললেন "বাবা, আমি তোমাদের সম্মেলনের মূল সভাপতি। আমার বন্ধু দিলীপ আজ গান গাইবে, তার গান শুনতে এসেছি। যদি ঢুকতে দাও তো ভালো, নইলে ফিরে যাব।"

এ কথা শুনে স্বেচ্ছাসেবকেরা পথ ছেড়ে দিলে এবং সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডপে ঢুকে মঞ্চের সামনে মাটিতে সতরঞ্চির উপর বসে পড়লেন।

দিলীপকুমারের গান আরম্ভ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ নিবিষ্ট মনে শুনছেন তাঁর বন্ধুর প্রাণমাতানো গান। এমন সময় মঞ্চের উপর উপবিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তাব নজর পড়লো তাঁর প্রতি।

তাঁরা তাড়াতাড়ি নেমে এলেন সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। বললেন, "স্যাব, আপনি ওপরে চলুন।"

সত্যেন্দ্রনাথ স্নিগ্ধ হেসে জবাব দিলেন, "আজ আমি তোমাদের সভাপতি নই। আজ আমাব বন্ধু দিলীপের গান শুনতে এসেছি। গান শুনেই চলে যাব, ওপরে উঠব না।"

সত্যেন্দ্রনাথের এ কথায় কর্মকর্তারা নিজেদের ত্রুটি উপলব্ধি করে লজ্জানত হয়ে ফিরে গেলেন।

এই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনেব আব এক অধিবেশনে দেখেছি, শিশিরকুমার প্রযোজিত ও অভিনীত 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানমণ্ডপে উপস্থিত হয়েছেন। মণ্ডপের সামনের সারিতে বসে তন্ময় হয়ে শিশিরকুমারের মর্মস্পর্শী অভিনয় দেখলেন একেবারে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত। অভিনয়শেষে মঞ্চের উপর উঠে গিয়ে শিশিরকুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, "আজ সত্যকার মাইকেলকে যেন চোখের সামনে দেখলুম! অভিনয় দেখা সার্থক হলো।" সত্যেন্দ্রনাথের এই আন্তরিক অভিনন্দনে শিশিরকুমারও সেদিন পরম প্রীত হয়েছিলেন।

প্রথিতযশা অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণবিয়োগের পর মহাজাতি সদনে যে স্মৃতিসভা হয় সে সভাতেও সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর পরলোকগত বন্ধু ও এককালীন প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেদিনের আলোকচিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাশে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের উপস্থিতি অনেকের কাছে বিসদৃশ লেগেছিল বলে

শুনেছি। কিন্তু যাঁরা এ দৃশ্য ভালো চোখে দেখেন নি, তাঁরা শুধু বিজ্ঞানাচার্যকেই দেখেছিলেন—বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথকে দেখেন নি।

সঙ্গীতপিপাসু সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় যদিও বা কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানপিপাসু সত্যেন্দ্রনাথের মনের পবিধি এত ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী যে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞানের কত বিভিন্ন ও বিচিত্র ক্ষেত্রে তিনি যে বিচরণ করেন এবং শুধু বিচরণ নয় গভীরে প্রবেশ করেন তা বলা যায় না। কখনও দেখেছি তিনি জাপানী শিল্পকলা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করছেন, কখনও দেখেছি রমণ মহর্ষির জীবনী পড়ছেন, কখনও বা পড়েছেন পোপ রচিত বাইবেলের সমাজব্যবস্থা, আবাব কখনও বিবেকানন্দের মূল ইংরেজি রচনাবলী।

বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কোনো বিষয়ই তুচ্ছ বা অবজ্ঞেয় নয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস,পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতির মধ্যে যে সাধনা ও মনীষাব স্বাক্ষর আছে, মানুষ হিসাবে তা জানা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তাই শ্রদ্ধা নিয়ে, আগ্রহ নিয়ে তিনি সব কিছুর মধ্যে সত্য খুঁজে পেতে চান।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায তাঁর বিদগ্ধ মনের একটি পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ (Origin and Development of Bengali Language) সম্পর্কিত আমার বৃহৎ গ্রন্থখানি রচনাকালে আমি কখনও কখনও আমার ছাপানো ফাইলগুলি ও প্রুফ সত্যেনকে দেখাই। সত্যেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাকে তাৎপর্যপুর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সেগুলি আমি সানন্দে গ্রহণ করি। আমার বই-এর ভূমিকায় আমি সেকথা বোধ হয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলুম।"

বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথের এক অপরূপ চিত্র এঁকেছেন 'বারোজনা'র নামদাতা ও অন্যতম সদস্য শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর সুনিপুণ ভাষায়—"দেখলুম একদিন আঁদ্রে জিদ সম্বন্ধে ফরাসী বই পড়ছেন। জিদের কথা তিনি যত জানতেন আমি তত জানতুম না। প্যারিসে শুনেছিলুম। বললেন দরদের সঙ্গে।

সমালোচকের মতো নয়। জার্মান ভাষায় তাঁর দখলের পরিচয় আগেই পেয়েছিলুম। ফরাসী ভাষায় দখলের পরিচয় আরো কয়েকবার পেলুম। একদিন দেখি মিশলে রচিত মূল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়ছেন। বললেন ইংরেজি তর্জমা পড়ে আশ মেটে নি। বহু চেষ্টায় মূল সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তাই তন্ময় হয়ে অধ্যয়ন করছেন। ফরাসী বিপ্লব আমার নিজের প্রিয় বিষয়। অথচ আমি তার জন্যে আয়াস স্বীকার করি নি। আলোচনাও করলেন কৌতূহলীর মতো। সেরকম কৌতূহল যদি ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখতুম। আসলে কী হয়েছিল সেই ভিতরের খবরটাই তিনি জানতে চান। ইতিহাস লেখকরা সেটা হয়তো জানেন না কিংবা জানলেও ভেঙে বলেন না। পাছে স্বজাতি বা নায়কদের প্রতিমা ভঙ্গ হয়। সেক্ষেত্রেও সত্যেন্দ্রনাথ দরদী বিবেচক। সমালোচক নন।

এরপর একদিন লক্ষ্য করি তিনি ফরাসীদের আরো পুরোনো ইতিহাসে মগ্ন। বললেন ফরাসী বিপ্লবকে বুঝতে হলে আরো কয়েক শতক পেরিয়ে যেতে হয়। তাই তিনি পড়ছেন ষোড়শ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত।

অন্য একদিন দেখি সংস্কৃত বই পড়ায় নিবিষ্ট। ভাসের 'চারুদত্ত'। সবটা মনে নেই। যতদূর বুঝলুম পরবর্তী নাট্যকারের 'মৃচ্ছকটিক' এরই উপর ভিত্তি করে রচিত। কোনটা আগে কোনটা পরে তার প্রমাণ একই শব্দের বিবর্তন। এর থেকে এলো শব্দতত্ত্ব। সংস্কৃত খুব ভালো জানা ছিল তাঁর। আমার তেমন নয়। অবাক হয়ে শুনলুম।

আরেক দিন দেখি পিশেল প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণের মূল জার্মান গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ তাঁর হাতে। মূলও তিনি পড়েছেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি যেন কত জানি! এরপরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মশারি খাটিয়ে শুয়েছেন। ভাবলুম অসুখ-বিসুখ করেছে। তা নয়। মশার জ্বালায় মশারির আশ্রয় নিয়েছেন। সেই অবস্থায় পড়া হচ্ছে আফগানিস্থানে সদ্য আবিষ্কৃত অশোকের আরামাইক লিপিতে উৎকীর্ণ অনুশাসন। আমার কাছে নতুন।

এমনি অনেক উদাহরণ দিতে পারি। বিদ্যা—তা যে কোনো বিভাগেই হোক—সত্যেন্দ্রনাথের নিঃশ্বাসবায়ু। জ্ঞানকে তিনি বিভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ রাখবেন না। তিনি বিজ্ঞানী বলে সেই একটি কক্ষে আবদ্ধ থাকবেন না। সমস্ত জ্ঞানই অবিচ্ছিন্ন একটা প্রবাহ। যেখানে খুশি যখন খুশি অবগাহন

করবেন। তৃপ্ত হবেন। তাজা থাকবেন। তাঁকে সেইজন্যে এত তাজা লাগে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী হলে ভাজা ভাজা লাগত।"

অন্নদাশঙ্করের এই লেখনী-চিত্রের মধ্যে এতটুকু রঙের প্রলেপ নেই, একেবারে শাদাকালোয় আঁকা বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথের একটি নিখুঁত চিত্র এটি। শিশুর মতো সদা-কৌতূহলী মন নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আজও তাই নিত্যনতুন জ্ঞানের সাগরে অবগাহন করেন।

তাঁর এই বিদগ্ধ মানসের আর একটি অপরূপ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই তাঁর বসবার ঘরে শোভিত দুজন মহামনীষীর প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে। তাঁর ঘরে এই দুটিমাত্র চিত্রই শোভিত—একটি মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের এবং অপরটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের। তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসের সঙ্গে বিদগ্ধ মানসের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তার প্রতিফলন যেন মূর্ত হয়েছে এই দুই মহামনীষীর প্রতিকৃতিতে। তাই একদিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর অতুলনীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছেন, তেমনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অর্কেষ্ট্রা' কাব্যগ্রন্থ এবং শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'জাপানে' ভ্রমণগ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করেছেন।

আর এই কারণেই বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখেন নি, তাঁর বিদগ্ধ মন নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী, ফেডারেশন হল সোসাইটি, নারিকেলডাঙা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট, আদি মহাকালী পাঠশালা, বয়েজ ওন লাইব্রেরী অ্যাণ্ড ইয়ং মেনস ইনষ্টিটিউট, কিশোর কল্যাণ পরিষদ, ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি অফ ইণ্ডিয়ান মিউজিক প্রভৃতি নানা সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত রয়েছেন।

মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ একবার তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—"আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক দিকটা যদিও বা বাইরে থেকে কিছুটা বোঝা যায়, কিন্তু মানুষ সত্যেন্দ্রনাথকে বোঝা খুব সোজা নয়।"

সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি অনেক পরে—তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার পর। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর সান্নিধ্যে থেকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে যে সকল মহান দিকের পরিচয় পেয়েছি তাতে মুগ্ধ অভিভূত হয়েছি। এক এক সময় মনে হয়েছে বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি আমাদের মনকে যতখানি টেনেছেন তার চেয়েও বোধ হয় বেশি টেনেছেন মানুষ হিসাবে। তবু কতটুকুই বা আমরা তাঁকে মানুষ হিসাবে জানতে পেরেছি আমাদের স্বল্পপরিসর সান্নিধ্যে আসার সুযোগে।

তাই শুধুমাত্র নিজের উপলব্ধির কথায় নয়, সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু সহপাঠী, সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কথার সাহায্য নিয়ে এই দুরূহ চরিত্রচিত্রণে অগ্রসর হচ্ছি।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন—"আজ পর্যন্ত এক সুভাষ (নেতাজী সুভাষচন্দ্র) ছাড়া আর কোনো বন্ধুই আমার চিত্তকে সত্যেনের মতন অধিকার করতে পারে নি। যদিও বন্ধু হিসেবে আমার কাছে সুভাষ হয়ে উঠেছিল হিরো-ই বলব, তবু সত্যেনের কাছেও আমি জীবনে কম পাথেয় পাই নি—বিশেষ করে চিন্তা, সংস্কৃতি ও স্বাধীন চিন্তার রাজ্যে।......আমি ওকে ভালবেসেছিলাম প্রধানত তিনটি কারণে ওর অসামান্য স্নেহশক্তির জন্যে, ওর দৃঢ়মূল সত্যনিষ্ঠার জন্যে, ওর বহুমুখী অনুসন্ধিৎসার জন্যে।"

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে যে স্নেহশীল দরদী মন নিত্যপ্রবাহিত তার স্পর্শ যিনি একবার পেয়েছেন তিনিই জানেন সে স্নেহ, সে দরদ কত গভীর, কত অন্তর-স্পর্শী। এবং তাঁর এই স্নেহধারা শুধুমাত্র পরিচিত পরিজন, বন্ধু-বান্ধব বা স্নেহ-

ভাজন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমিত নয়, অপরিচিত জনেরও প্রতি অবারিত। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ছোট বড় পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই তিনি নিজের সহজিয়া ছন্দে আপন করে নেন।

মানুষের সঙ্গে মানুষের এই প্রীতি-ভালবাসার মূল্য সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অপরিসীম। তাই তিনি বলেছেন—"আমার ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড লাভ বইপত্র অধ্যাপকদের লেকচার নয়, সতীর্থদেব সঙ্গে নিত্য-নতুন প্রীতির সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই আমি পথচলার সবচেয়ে বেশি পাথেয় পেয়েছি। যারা শুধু পডা-শোনায় ভালো ছেলে তারা তথ্যের বা জ্ঞানের কোঠায় হয়তো সবই পেতে পারে, কিন্তু পায় না বন্ধুর অমূল্য সংস্পর্শের মনজাগানিয়া দান। আমাদের তরুণ মন সত্যি জেগে ওঠার জন্যে এই সখ্যের অপেক্ষা রাখে, বিশেষ করে কৈশোরে ও যৌবনে।"

সত্যেন্দ্রনাথ এইভাবেই তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে মিশেছেন, নানাজনকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই গভীর বন্ধুপ্রীতি ও অনাডম্বর অন্তরঙ্গতার কথা বলতে গিয়ে দিলীপকুমার বলেছেন—"মেলামেশার মধ্য দিয়ে সে অনেক কিছু আহরণ করত বলেই পারত অনেক কিছু দান করতে।......বন্ধুদের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো খুঁটিনাটি ও সমস্যার কথা শুনতে সে কখনো বিরক্ত হত না। তাই অনেকেই দেখতাম তার কাছে এসে ধর্না দিত সমাধান চেয়ে। এদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন প্রধান প্রষ্টা—প্রায় নচিকেতার কাছাকাছি : যখনই কোনো প্রশ্ন কি সমস্যা হাজিরি দিত সটান তার কাছে এসে দরবার করতাম। এমন বন্ধুগতপ্রাণ মানুষ পিতৃদেবের পরে আর আমি দেখি নি। যাকেই একবার বন্ধু বলবে তারই খোঁজ নেবে যথাসাধ্য। আমার এক ধনী জমিদার বন্ধু পাকীস্তানের ফেরে পড়ে যখন বৃদ্ধ বয়সে দেউলে হয়ে দিল্লীতে চাকরি নেন. সত্যেন খুঁজে খুঁজে তাঁর দীন ডেরায় গিয়ে হাজির। তখন দিল্লীতে সে রাজ্যসভার সভ্য, মস্ত লোক। কিন্তু তার কাছে ধনী-গরিব, বড়-ছোট ছিল না—বন্ধু হলেই হল।"

সত্যেন্দ্রনাথের এই দরদভরা বন্ধুপ্রীতির আর একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'ঝিলিমিলি' লেখায়—"সেবার Indian

Science Association-এর বাৎসরিক সভায় (Indian Science Congress, দিল্লী অধিবেশন, ১৯৪৪) সত্যেন সভাপতিত্ব করছে। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের লাট ওয়াভেল সাহেব সকলকে খানা দিলেন। সেদিনকার সত্যেনই প্রধান অতিথি, আশা করেছিলেন সে এসে পৌছবে। রাত ৯টা পর্যন্ত এলো না—তারপরও নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল এই—দুপুর বেলা একজন পুরাতন স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা; তারই সঙ্গে টাঙ্গা চড়ে তার বাড়ি হাজির এবং সেইখানেই সারাদিন সে আর তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করল, রাত্রে খেয়েও এলো। ওয়াভেল সাহেবের সাথে আর দেখা হল না।

পরের দিন লেডি ওয়াভেল জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল Sailor boy! এলে না কেন? আমরা সব তোমার জন্য বসেছিলাম। আমতা আমতা করে একটা জবাব খাড়া করলে। সে কদিন কলকাতার চাঁদনী-থেকে কেনা একটা টুপি সারাদিন মাথায় পরেছিল। জামাকাপড়েরও সেই দশা।"

সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়-উজাড়করা বন্ধুপ্রীতির আর একটি অনুপম কাহিনী শুনেছি অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের কাছে; তাঁর নিজের ভাষায় সেটি উল্লেখ করছি—"আমার সমসাময়িক বন্ধু পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (ঢাকার বারো-জনার তিনি ছিলেন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক) ছিলেন ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পরে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেছিলেন। বহুদিন রোগভোগের পর প্রায় তিন বছর হলো তাঁর দেহাবসান হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ পুণ্যেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন, পুণ্যেন্দ্রনাথও সত্যেন্দ্রনাথকে বড় ভাই-এর মতো শ্রদ্ধা করতেন। পুণ্যেন্দ্রনাথের মতো ন্যায়পরায়ণ, ধীমান, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল মানুষ খুব কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি হত। এই অবস্থায় তাঁকে সামলানো খুবই মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। কতবার দেখেছি পুণ্যেন্দ্রনাথের এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পারিবারিক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে শুশ্রূষা করেছেন, নিজের হাতে দাড়ি কামিয়ে দিয়েছেন এবং স্নান করিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় যখন পুণ্যেন্দ্রনাথ বহুদিন অসুস্থ—রোগশয্যায় তাঁর সেবা ও সাহায্য পুণ্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর মনে শক্তি দিয়েছে। পুণ্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়েও

সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। পরের জন্যে নিজেকে এমনভাবে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে কয়জন পারেন ?"

সত্যেন্দ্রনাথের এই দরদভরা বন্ধুপ্রীতির মতো তাঁর বন্ধুকৃত্যও গভীর। ১৯৬১ সালের কথা। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর কয়েক মাস আগে সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু অতুলচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করেন। অতুলচন্দ্র বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তার সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সেই বছরের অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হন।

পরলোকগত বন্ধুর কথা স্মরণ করে সত্যেন্দ্রনাথ-এ প্রস্তাবে সানন্দেই সম্মত হলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন দিনে উদ্যোক্তারা সত্যেন্দ্রনাথকে সমাদরে অনুষ্ঠানক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, অতুলচন্দ্রেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে তাঁরা যে বিশেষ সভার আয়োজন করেন সেই সভার কথা সত্যেন্দ্রনাথকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

সম্মেলন সমাপ্ত হবার পর একদিন অন্য এক উপলক্ষে উদ্যোক্তারা যখন সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাতে আসেন সেদিন দেখেছিলুম, সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠে তাঁদের শোনালেন—"আমার বন্ধুর নাম করে তোমরা আমাকে সভাপতি হবার অনুরোধ জানিয়েছিলে, কিন্তু বন্ধুর স্মৃতি সভার দিন আমাকে একবার খবর পর্যন্ত দিলে না!"

উদ্যোক্তারা আমতা আমতা কবে বললেন, "আমরা ভেবেছিলুম আপনি ওদিন যেতে পারবেন না। তাই আর বলি নি আপনাকে।"

এ-কথা শুনে স্মিত হেসে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তোমরা একবার বলে দেখতেও তো পারতে আমি যেতুম কিনা। আমাকে সভাপতি করলে, অথচ আমার বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগই তোমরা আমায় দিলে না!"

সেদিন দেখেছিলুম বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করতে না পারায় সত্যেন্দ্রনাথের দুঃখ ও ক্ষোভ কত গভীর!

সত্যেন্দ্রনাথের এই দরদী অন্তরের স্পর্শ তাঁর বন্ধুজন ও সহকর্মীরা যেমন

পেয়েছেন, তেমনি আমরা বয়োকনিষ্ঠরাও তাঁর হৃদয়ভরা স্নেহে নিত্য অভিষিক্ত হয়েছি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সকল ছাত্র-ছাত্রীরই তিনি 'মাস্টার মশাই'। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি কেবল শিক্ষাদাতা গুরু নন, তাদের সুখদুঃখের সমব্যথী অভিভাবকস্বরূপও। তিনি যেমন তাদের কাজ-কর্মের খবর নেন, তেমনি তাদের পারিবারিক খবরও নিতে ভোলেন না।

তাঁর কাছে কোনো কাজ উপলক্ষে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, কাজের কথা হবার পর তিনি আপনা থেকেই জিজ্ঞেস করেন—"তোর বাবা কেমন আছেন? তোর মা কেমন আছেন? তোর দাদা এখন কোথায়?" এমন আরও কত স্নেহভরা প্রশ্ন। অনেক সময় দেখেছি তিনি দরকারী কথা বরং ভুলে যান, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দুঃখ দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কথা (যা তাঁর মনে না থাকাই স্বাভাবিক) ঠিক মনে রাখেন এবং সেবিষয়ে খবরও নেন।

তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেলে তিনি অধিকাংশ সময়েই এটা ওটা না খাইয়ে ছাড়েন না। আমাদের অনেক সময় খেতে সংকোচ বোধ হয়। কিন্তু তিনি তা দেখে বলতে আরম্ভ করেন—"এই তুই খাচ্ছিস না যে! চা খেলি শুধু, মিষ্টিটাও খেয়ে নে।"

ছাত্র বা স্নেহভাজনদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের মমত্ববোধ ও দরদ যে কত গভীর তার একটি অতুলনীয় ঘটনা আমার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে আছে।

সেবার (১৯৫৮ সালে) জব্বলপুরে আয়োজিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি-পদে বৃত হয়েছেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে লেখকও চলেছেন সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে অধিবেশনে যোগ দিতে।

এক রাত্রি ট্রেনে অতিবাহিত হবার পর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বোম্বাই মেল যখন জব্বলপুর স্টেশনে এসে পৌছল, তখন প্ল্যাটফরমে অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তাদের বিশেষ কাউকে দেখা গেল না।

মাস্টার মশাই বললেন, "চল্, আমরা স্টেশনের বাইরে যাই, সেখানে হয়তো কর্তা-ব্যক্তিদের দেখা পাওয়া যাবে।"

কুলীর মাথায় বিছানাপত্র চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দেখা গেল, অভ্যর্থনা সমিতির কর্তাব্যক্তি দু'একজন সেখানে সত্যিই উপস্থিত রয়েছেন।

মাস্টার মশাই তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের থাকবার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে ?"

স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী এগিয়ে এসে বললেন, "আপনি আমার বাসায় চলুন, সেখানে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।"

উত্তরে মাস্টার মশাই (লেখককে দেখিয়ে) তাঁকে বললেন, "আমার সঙ্গে আমার এই ছাত্রটি থাকবে। আপনার ওখানে আমাদের দুজনের জায়গা হবে তো ?"

এ কথা শুনে প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী কোনো উত্তর দিলেন না।

মাস্টার মশাই আরও দুবার পূর্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

কিন্তু প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী পূর্বের মতোই চুপ করে রইলেন।

সামনে দাঁড়িয়েছিলেন স্থানীয় মহাকোশল মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মুখার্জি। মাস্টার মশাই তাঁকে দেখে বললেন, "মুখুজ্জে মশাই, আপনার ওখানে আমাদের দুজনের জায়গা হবে ?"

প্রিন্সিপাল মুখার্জি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হলেন।

সেই অনুযায়ী আমরা যখন মুখুজ্জে মশায়ের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর স্ত্রী শ্রীমতী চক্রবর্তী এসে হাজির হলেন।

তিনি মাস্টার মশায়ের পথ রোধ করে বললেন, "আমি সকাল থেকে আপনার জন্যে রান্নার আয়োজন করেছি আর আপনি মুখুজ্জে মশায়ের বাড়িতে যাবেন, তা কেমন করে হবে ?"

মাস্টার মশাই তাঁকে সবিনয়ে জানালেন, "আমি মুখুজ্জে মশাইকে কথা দিয়ে ফেলেছি, তাঁর ওখানেই এখন যাই। পরে আপনাদের বাড়িতে যাব।"

এ কথা শুনে শ্রীমতী চক্রবর্তী বেশ ক্ষুব্ধ হলেন মনে হলো। আর কোনো কথা না বলে সটান তাঁর গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

পরে মুখুজ্জে মশায়ের বাড়িতে এসে মাস্টার মশাই বললেন, "ভাখ, আমি ভদ্রলোককে তিন তিনবার বললুম, আমার সঙ্গে আমার ছাত্রটি না থাকলে অসুবিধে হবে। কিন্তু ভদ্রলোক একবারও হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না।

মনে হলো ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের দুজনকে একসঙ্গে রাখতে চান না। তাই ওঁর ওখানে আর গেলুম না।"

পরের দিন ভোরে উঠেই মাস্টার মশাই বললেন (শ্রীমতী চক্রবর্তীর কথা উল্লেখ করে), "ভদ্রমহিলা বড়ো চটে গেছেন রে। ওঁর ওখানে একবার গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি।" এবং সত্যিসত্যিই তিনি মুখুজ্জে মশায়ের গাড়িতে করে প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর বাড়িতে দেখা করতে গেলেন।

এই হচ্ছেন দরদী মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ যিনি একদিকে যেমন ছাত্রের কথা ভেবে নিজের সমাদর স্বেচ্ছায় পরিহার করতে পারেন, আবার তেমনি তাঁর কথায় কেউ আঘাত পেলে তাঁকে শান্ত করতে নিজেই ছুটে যান।

সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রবাৎসল্যের আর একটি মনোজ্ঞ ঘটনা। তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীয় গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্যে আমন্ত্রিত হন। কিন্তু তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁর ছুটি মঞ্জুরের ব্যাপারে গড়িমসি করতে থাকেন।

সত্যেন্দ্রনাথ এ কথা জানতে পেরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের কাছে সরাসরি একটি চিঠি লিখে পাঠালেন। ফলে ছাত্রের ছুটি মঞ্জুর তো হলোই এবং সেইসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে বিদেশে যাওয়ার খরচ বাবদ অর্থসাহায্যও তিনি লাভ করেন।

বিদেশযাত্রার আগে ছাত্রটি যখন অধ্যাপক বসুকে প্রণাম করতে এলেন, সত্যেন্দ্রনাথ তখন তাঁর যাত্রার সময় জেনে নিয়ে নিজে বিমানবন্দরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এবং বিদেশের অধ্যাপকদের উপহার দেবার কথা ওঠায় নিজের কেনা শান্তিনিকেতনের চামড়ার কাজ করা একটি সুদৃশ্য বাক্স ছাত্রকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "এটা কাউকে উপহার দিস্।"

সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহশীল হৃদয়বত্তার আর একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করে প্রসঙ্গান্তরে অগ্রসর হব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে তাঁর অধীনস্থ একজন কর্মী মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে অর্থসাহায্য নিত। একবার তিনি তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন, এমন সময় সেই কর্মীটি এসে তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য চাইলো।

সেদিন সত্যেন্দ্রনাথের মনিব্যাগে টাকা-পয়সা বিশেষ ছিল না। যা ছিল, ব্যাগটি উপুড করে সব টেবিলের উপব ঢেলে কর্মীটির হাতে দিয়ে বললেন, "ব্যাগে যা ছিল সবই তোকে দিলুম। আজ এখন যা।"

সত্যেন্দ্রনাথেব স্নেহভালবাসা শুধুমাত্র মানুষেব প্রতি বর্ষিত হয় না, জীব-জন্তুর প্রতিও তাঁব স্নেহ কম নয়। তাঁব পোষা একটি কুকুর ও দুটি বেরাল আছে। একটি বেবালেব নাম কেলো এবং অপবটিব নাম গদা। সত্যেন্দ্রনাথ তাদের আদর করেন, নিজেব খাবাবের ভাগ দেন। তাঁর বিছানাতে উঠে বেরালরা অনেক সময স্বখনিদ্রাও যায। কিছুকাল যাবৎ কেলো নিরুদ্দিষ্ট। গদা এখন 'একমেবাদ্বিতীযম্' হযে আদবযত্নেব সবটুকুই ভোগ করে। যখন তিনি টেবিলেব উপব কাগজপত্র নিযে লেখালিখি করেন, তখন অনেক সময গদা টেবিলে উঠে চোখ বুজে শুযে থাকে। কখনও কখনও প্রভুর আদরের স্পর্শ লাভেব জন্যে সে মাথাটা এগিয়ে আনে, কখনও বা তার মোটা লেজটা তাঁর বাঁ হাত ছু যে ছু যে নিজেব সান্নিধ্য জানিয়ে দেয।

সত্যেন্দ্রনাথেব চবিত্রে নিঃস্বার্থ ভালবাসার পব যে মহৎ দিকটি সকলকে আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে তাঁর আত্মউদাসীন নিরহঙ্কার ভাব। আজকের যুগে স্বল্পখ্যাত ব্যক্তিরাও যেখানে আত্মপ্রচাবে পঞ্চমুখ এবং তার জন্যে অপরিসীম আত্মশ্লাঘা অনুভব কবেন, সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েও নিজের সম্বন্ধে একেবারে নীবব ও উদাসীন। নিজের বা নিজের কাজ সম্বন্ধে কোনো কথা তিনি সচরাচর বলতে চান না এবং তাঁর নাম প্রচারের কোনো আয়োজন হলে তা সযত্নেই এড়িয়ে চলতে চান।

সত্যেন্দ্রনাথের আত্ম-উদাসীনতার একটি অনুপম চিত্র পাওয়া যায় শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য কথিত একটি ঘটনায়। ১৯২৪-২৫ সালের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রথম বিদেশযাত্রা করে প্যারিসে উপনীত হযেছেন। প্যারিসে 17 Rue du Sommerard ঠিকানায় ভারতীয় ছাত্রসংসদের একটি আশ্রয়স্থলে সত্যেন্দ্রনাথ, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও গিরিজাপতি একত্রে রয়েছেন। সেই-সময়কারই ঘটনা এটি।

গিরিজাপতি বলছেন—"একদিন সারা রাত বরফ পড়েছে। সকালে উঠে দেখি, পেঁজা তুলোর মত সাদা বরফে চারিদিক রাস্তা বাড়ি ছেয়ে গেছে।

কনকনে ঠাণ্ডা। সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে এলাম। তিনি 'শোকোনা (কোকো) আনবার আদেশ দিয়ে আইনষ্টাইনের মন্তব্য সম্বলিত ছাপানো গবেষণার এক কপি হাতে দিলেন। সেটি নিয়ে আমি যথাসাধ্য বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ব্যাপারটি মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ মূল ইটালিয়ান ভাষায় লেখা Dante-র 'The Divina Commedia'-তে মনোনিবেশ করলেন। বইটি সবে সেদিন সকালে পড়তে সুরু করেছিলেন; ছাপানো গবেষণার কপিগুলি সদ্য সেই সময় তাঁর হাতে এসেছিল।

আমি গবেষণার বিষয়বস্তু ও আইনষ্টাইনের চিন্তায় নিমগ্ন হলাম। আর সত্যেন্দ্রনাথ একটানা দান্তে পড়ে শেষ করলেন। তাঁর গবেষণা আইনষ্টাইন কর্তৃক সমর্থিত, আদৃত ও প্রকাশিত হয়ে বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে, এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। বই পড়া শেষ করে আমাকে নিয়ে একত্রে বরফ পড়ার মধ্যেই 'লাঞ্চ' খেতে বেরিয়ে পড়লেন।"

এই আত্ম-উদাসীনতা শুধুমাত্র তাঁর নিজের নাম বা নিজের কাজ প্রচারের বিমুখতার মধ্যে সীমিত নয়, সাংসারিক বা বৈষয়িক উদাসীনতায়ও তা প্রকাশিত। এর একটি অপূর্ব ঘটনা শুনেছি অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের কাছে।

১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হয়ে চলে আসার কয়েক দিন আগের ঘটনা এটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে তাঁর ঘরে একদিন তাঁকে অনেকক্ষণের জন্যে দেখা যায় নি। নিজের ঘরে যখন ফিরে এলেন, তখন সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" তিনি সরল হাসি হেসে বললেন, "আমার ব্যাঙ্কে গিয়ে সব লাল আজ কালো করে এলুম।"

বুঝতে বাকী রইলো না যে নানাজনকে সাহায্য করতে গিয়ে এতদিন ব্যাঙ্কে যা overdraw করেছিলেন, Provident Fund-এর টাকা থেকে সেই ঋণ শোধ দিয়েই তিনি লালকে কালো করেছিলেন, তাঁর হাসির মধ্য দিয়ে এই মর্মান্তিক কথাটাই সেদিন ফুটে উঠেছিল।

শুনেছি বহু লোককেই তিনি এভাবে অকাতরে সাহায্য করেছেন নিজের দিকটা চিন্তা না করে। তাই দীর্ঘকাল ভালো উপার্জন করা সত্ত্বেও সঞ্চয়ের দিক থেকে তিনি প্রায় নিঃসম্বল।

সত্যেন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিন খ্যাতি বা প্রতিপত্তির পেছনে ছোটেন নি। এমন কি, তাঁর কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল এম এস সি ডিগ্রীমাত্র নিয়েই তিনি আত্মতুষ্ট থেকেছেন চিরকাল, ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্যে কোনোদিন থিসিস পেশ করেন নি বা সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যেও তদ্বির করেন নি। সত্য-সাধক ঋষির মতো তাঁর মর্মচেতনায় যেন অনুরণিত হয়েছে—

"সকল ভুলে যতই দিবারাতি
নামটারে ঐ আকাশ-পানে গাঁথি,
ততই আমার নামের অন্ধকারে
হারাই আমার সত্য আপনারে।"

তাই সত্যসাধক সত্যেন্দ্রনাথ নাম বা যশের প্রতি চির-উদাসীন। এই আত্ম-উদাসীনতার জন্যেই হয়তো স্বদেশে বা বিদেশে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি ঘটেছে অনেক বিলম্বে। আজকের দুনিয়ায় নিজে উদ্যোগী না হলে যেখানে কার্যসিদ্ধি হওয়া প্রায় অসম্ভব, প্রচারসর্বস্ব সে দুনিয়ায় সত্যেন্দ্রনাথের মতো আত্মপ্রচারবিমুখ বিজ্ঞানী যে অবহেলিত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। তা নইলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি কৃতী ছাত্র এবং যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা ও শেষ জীবনে যার সেবা করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং আজও যেখানে তাঁর কর্মস্থল, সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করলেন কেন এত বিলম্বে। নিজের শিক্ষাদাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যখন এত বিলম্বে সমাদর হয়, সেক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কর্তব্যবোধের প্রত্যাশা করা দুরাশামাত্র!

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসও সত্যেন্দ্রনাথকে মূল সভাপতিপদে বরণ করেছেন বহু বিলম্বে। ১৯২৪ সালে তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে খ্যাতি অর্জন করলেও তার দীর্ঘ কুঁড়ি বছর পরে তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মান প্রদর্শন করেন।

স্বদেশের মতো বিদেশেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বীকৃতি ঘটেছে অনেক বিলম্বে। তাঁর জীবনের প্রায় সায়াহ্নে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেন এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডিরাক উদ্যোগী হয়ে চেষ্টা করাতেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের আত্মপ্রচার-বিমুখতার আর একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। ১৯৬৩ সালের পয়লা জানুয়ারীতে সত্যেন্দ্রনাথ সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করেন। সেই উপলক্ষে তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও বন্ধুরা একটি আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজনে উদ্যোগী হন। স্থির হয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ ভবনে এই অনুষ্ঠান হবে।

মাস্টার মশাইকে আমাদের এই অভিপ্রায়ের কথা প্রথম যখন জানাতে যাই, তিনি তখন একেবারই গররাজী হলেন। বললেন, "কি হবে এ-সব হৈ চৈ করে।"

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগেব তদনীন্তন ডীন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের মাবফত মাস্টার মশায়েব কাছে পুনবায় এ অভিপ্রায় উথাপন করা হলো।

অধ্যাপক খাস্তগীরের অনুরোধে মাস্টাব মশাই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন, কিন্তু একটি শর্তে—বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তিনি যাবেন না, ঘবোয়াভাবে কারো বাড়িতে আয়োজন হলে যেতে পারেন।

সেই অনুযায়ী সেবার ঘরোয়াভাবে তাঁর জন্মোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। আত্মপ্রচারের সামান্যতম সুযোগ পেলে আজকের দুনিয়ায় অনেকেই যেখানে সাগ্রহে এগিয়ে আসেন, আত্মপ্রচারবিমুখ সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে স্বেচ্ছায় এড়িয়ে যান।

আর আত্ম-উদাসীন বলেই সত্যেন্দ্রনাথ এত নিরহঙ্কার সহজ সরল মানুষ। তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেও মানুষ হিসাবে তাঁর দ্বার সকলের কাছে সদা অবারিত। এ যেন তাঁরই উদ্ভাবিত 'বোস সংখ্যায়ন'-এর মূর্ত রূপ! বোস সংখ্যায়ন অনুযায়ী সমগোষ্ঠীর মৌলিক কণা যেমন একই অবস্থায় একাধিক থাকতে পারে, তেমনি অধ্যাপক বসুর ঘরে যে খুশী, যত খুশী লোক আসতে পারে—তাঁর দ্বার অবারিত। সমাজের উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরের যে কোনো লোক তাঁর ঘরে ঢুকতে পারে—ঢুকতে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তাঁর বাড়িতে গিয়ে কতবার দেখেছি, কত লোক সময়ে-অসময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের নানা প্রয়োজনের কথা জানাচ্ছেন। কেউ এসেছেন তাঁর বই-এর ভূমিকা লেখার আবেদন নিয়ে, কেউ এসেছেন

পাসপোর্ট অফিসারকে টেলিফোন করে বলার জন্যে অনুরোধ করতে, কেউ বা এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বলে তাঁর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিতে, আবার কেউ হয়তো এসেছেন চাকরির জন্যে তাঁর পরিচিত জনের কাছে চিঠি লিখে দেবার অনুরোধ নিয়ে। এ-ছাড়া, সভা-সমিতির অনুষ্ঠানের জন্যে তাঁর কাছে লোকজনের আসার বিরাম নেই। শুধু বিজ্ঞান-সভা নয়, সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প সংস্কৃতির সকল আসর থেকেই তাঁর কাছে প্রায়ই ডাক আসে।

সত্যেন্দ্রনাথ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সকলেরই কথা শোনেন এবং তাঁর সাধ্যমতো সকলকেই সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। এবং যখন তাঁর পক্ষে কারো অনুরোধ রক্ষা সম্ভব হয় না, তখনও সস্নেহে তাঁর অক্ষমতার কথা জানান। ফলে অনুরোধকারীর প্রার্থনা পূর্ণ না হলেও তিনি তাঁর দরদী হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে একটি পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যান।

আমার এক পরিচিত বন্ধু মাউন্ট এভারেস্ট আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। সত্যেন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে সঙ্গে করে একদিন কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে উপস্থিত হলেন এবং এতৎসম্পর্কিত বইপত্র আনিয়ে তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেন। এর কিছুকাল পরে তিনি যখন কার্যোপলক্ষে দিল্লীতে যান, তখন সেখানকার জাতীয় মহাফেজখানায় গিয়ে রাধানাথ শিকদার সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি দেখে এসে সেই বন্ধুটিকে জানিয়ে দেন। এমন কি, এই সম্পর্কিত একটি মূল্যবান চিঠির ফটোস্ট্যাট কপি করাবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিনি নিজেই তার ব্যয়ভার বহন করতে চেয়েছিলেন।

মানুষের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অসীম ধৈর্যের একটি মনোজ্ঞ ঘটনা শুনেছি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হারীতকৃষ্ণের কাছে। ঘটনাটি ১৯১৯ সালের, সত্যেন্দ্রনাথ তখন যুবক। সত্যেন্দ্রনাথ, হারীতকৃষ্ণ ও সুধীন্দ্র সিংহ তিন বন্ধু মিলে সেবার কোনারকের সূর্যমন্দির দেখার জন্যে পুরী থেকে একটি গরুর গাড়িতে রওনা হন।

জ্যোৎস্না রাতে সন্ধ্যার কিছু পরে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়। কিছু দূর এগোবার পর গাড়ির গাড়োয়ান সত্যেন্দ্রনাথকে বললো, "বাবু, আপনি সামনের দিকে এগিয়ে বসুন, নইলে গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল খুলে যাচ্ছে।"

গাড়োয়ানের কথা শুনে সত্যেন্দ্রনাথ সামনের দিকে একটু এগিয়ে বসলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে গাড়োয়ান আবার একই কথা উচ্চারণ করলো।

হারীতকৃষ্ণ ও সুধীন্দ্রনাথের চেহারা ছিপছিপে, সে তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথের চেহারা একটু স্থূল। সে-কারণে অপর দুজনকে অনুরোধ না করে গাড়োয়ান সত্যেন্দ্রনাথকেই এ কথা বার বার বলছিল।

অগত্যা সত্যেন্দ্রনাথ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। পুরী থেকে কোনারক পর্যন্ত প্রায় কুড়ি মাইল পথ বালির উপর দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সমস্ত রাত হেঁটে গেলেন। ভোর হবার পর হারীতকৃষ্ণ এবং সুধীন্দ্রনাথও গাড়ি থেকে নেমে সত্যেন্দ্রনাথের সহগামী হলেন। যখন তাঁরা সূর্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন, তখন পুব আকাশে অরুণ আভা দেখা দিয়েছে। সে অপরূপ নৈসর্গিক শোভা নিরীক্ষণ করে তাঁরা পথের শ্রম ভুলে গেলেন মুহূর্তে।

সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন কুসুমের মতো কোমলহৃদয়, অপর দিকে তেমনি বজ্রকঠোর সত্যনিষ্ঠ। জীবনে কোনোদিন কোনো পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর সত্যনিষ্ঠার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। সত্যরক্ষার জন্যে স্পষ্ট কথা বলতে তিনি কখনও দ্বিধা বোধ করেন নি। অতিসম্মানিত ব্যক্তি বা অন্তরঙ্গ বন্ধুজন থেকে অপরিচিত সাধারণ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলকেই প্রয়োজন বোধে অকপটে সত্য কথা তিনি বলে দেন। এর ফলে অনেক সময় তাঁকে অনেকের কাছে অপ্রিয় হতে হয়েছে, অনেককে ক্ষুণ্ণ করতে হয়েছে, হয়তো বা কোনো কোনো সময় তাঁর স্বার্থহানিও হয়েছে। কিন্তু যা সত্য বলে তিনি জেনেছেন তা থেকে কেউ কোনোদিন তাঁকে টলাতে পারেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে তাঁর ধারণা ভ্রান্ত বা অযৌক্তিক।

সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থার একটি ঘটনা। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়দিদি', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে বাংলাদেশের তরুণদের চিত্তকে তখন গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। তৎকালীন অন্যান্য ছাত্রের মতো সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন শরৎচন্দ্রের একজন অনুরাগী ভক্ত। শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ থেকে চলে আসার পর সত্যেন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর শিবপুরের বাড়িতে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করতেন।

একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার পর শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও

নীরেন্দ্রনাথ শিবপুর থেকে ট্রামে করে কলকাতার দিকে আসছেন। ট্রামের কণ্ডাক্টর অনেকক্ষণ টিকিট চায় নি। হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি রেলওয়ে ওভারব্রীজে ট্রাম ওঠার সময় টিকিট চাইলো।

সত্যেন্দ্রনাথ কণ্ডাক্টরের হাতে এক টাকা দিলেন। কণ্ডাক্টর কিন্তু টিকিট না দিয়ে শুধু বাকী পয়সা ফেরত দিলে।

কথাবার্তায় মেতে থাকায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে বাকী পয়সা গুণে দেখেন নি। পরে খেয়াল হতে মিলিয়ে দেখেন, যা ট্রামের ভাড়া কণ্ডাক্টর তার অর্ধেক নিয়েছে। তখন বাড়তি পয়সা কণ্ডাক্টরকে ফেরত দিতে গেলেন।

তা দেখে শরৎচন্দ্র একটু হেসে বললেন, "রেখে দাও, ঠিক আছে। ও তোমায় টিকিট দেয় নি, তাই অর্ধেক পয়সা নিয়েছে।"

প্রত্যুত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ কণ্ডাক্টরকে বললেন, "অন্যায়ের সঙ্গে আধাআধি বখরা করতে রাজী নই। টিকিটের যা দাম তার পয়সা দিচ্ছি, আমাকে টিকিট দিন।"

কণ্ডাক্টর তখন ঠিকমতো ভাড়া নিয়ে টিকিট দিলে।

পরবর্তীকালে কর্মজীবনের একটি ঘটনা। স্যার আশুতোষের আহ্বানে সত্যেন্দ্রনাথ তখন বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে লেকচারাররূপে যোগদান করেছেন। কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন জীবনে আশুতোষের পরিচালন ব্যবস্থায় কোনো কোনো ত্রুটি দেখা দিলে সত্যেন্দ্রনাথ সমালোচনা চেপে রাখতে পারতেন না।

স্যার আশুতোষ জবরদস্ত লোক ছিলেন। একারণে তাঁর কাজের সমালোচনা করতে কেউ সাহসী হতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ এভাবে সমালোচনা করায় তাঁর কোনো কোনো সহকর্মী বলতেন, "কাজটা ভালো হচ্ছে না, কর্তা চটে যাবেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু আশুতোষের বিরাগভাজন হবার ভয়ে কোনোদিন স্পষ্ট কথা বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি। একবার এম এস সি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে আশুতোষ একটি প্রশ্ন পর পর তিন বছর দেওয়া সত্ত্বেও কোনো পরীক্ষার্থী সেই অঙ্কটি করে নি।

পরীক্ষকদের সভায় যে কথা উল্লেখ করে আশুতোষ সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখকে

বললেন, "তোরা কি পড়াচ্ছিস? পর পর তিন বছর একই অঙ্ক দিলুম, কোনো ছেলেই কষতে পারলো না।"

সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উঠে বললেন, "অঙ্কটাই যে ভুল!"

আশুতোষ জিজ্ঞেস করলেন, "কে বললে ভুল?"

সত্যেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, "আমরা কষে দেখেছি। প্রফেসার ডি এন মল্লিকও কষে দেখেছেন অঙ্কটা ভুল।"

সত্যেন্দ্রনাথের এই স্পষ্টোক্তিতে আসল ব্যাপার জানতে পেরে স্যার আশুতোষ সেদিন অসন্তুষ্ট না হয়ে প্রসন্নই হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টারূপে সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সরকার সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এ বিষয়ে অভিমত জানতে চান। সত্যেন্দ্রনাথের অভিমতের উপরই এই বিষয়ে অর্থমঞ্জুর নির্ভর করছিল।

বন্ধু এসে সত্যেন্দ্রনাথকে এই বিষয়টি অনুমোদন করে দিতে বললেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখলেন, যেভাবে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে তাতে দেশের কল্যাণ বিশেষ সাধিত হবে না। তাই তিনি এবিষয়ে তাঁর সমর্থনসূচক অভিমত জানাতে পারলেন না।

বন্ধু একাধিকবার সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানালেন এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার জন্যে।

কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুর অনুরোধেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হলেন না। হেসে বললেন, "আমি যা ঠিক মনে করেছি সেটাই আমাকে বলতে দাও।"

সত্যেন্দ্রনাথ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ। সে-সময় স্নাতকোত্তর বিভাগের এম এ, এম এস সি পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার জন্যে তৎকালীন উপাচার্য শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ছাত্র-ইউনিয়ন দরবার করে।

বিশ্ববিদ্যালয় মহলে উপাচার্য শম্ভুনাথ অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ বলে তখন খ্যাত। কিন্তু তিনিও ছাত্রদলকে একেবারে সরাসরি 'না' বলতে পারলেন না। বললেন,

কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষরা যদি এ বিষয়ে সম্মত হন তা হলে তিনি আপত্তি করবেন না।

সেই অনুযায়ী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তারা কলা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে তাদের আবেদন জানালো।

শ্রীকুমারবাবু বললেন, তিনি রাজী আছেন, তবে বিজ্ঞান বিভাগেব অধ্যক্ষ অধ্যাপক বসুকেও এ বিষয়ে রাজী করাতে হবে।

ছাত্র ইউনিয়ন তখন সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তাদের আবেদন জানালো। কিন্তু তিনি ছাত্রদের এ আবেদনে সম্মত হতে পারলেন না। বললেন, "তোমাদের পবীক্ষা পেছবাব কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমি রাজী হতে পাবব না।"

ছাত্রমহলে নিজেদের জনপ্রিযতা বক্ষাকল্পে ইউনিযনের নেতাবা তখন অনন্যোপায় হযে জানালো, তাদেব দাবি আদাযের জন্যে তারা অনশন করবে।

একথা শুনে সত্যেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "তোমবা অনশন কবলে আমিও অনশন করব তোমাদেব অন্যায দাবিব প্রতিবাদে। আমি তো একবেলা খাই, আর একবেলা না হয নাই খাব।"

ইউনিয়নেব নেতাবা তখন শেষ অস্ত্র প্রযোগ কবলো, তাদেব দাবি না মানলে তারা সত্যেন্দ্রনাথের ঘবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কববে।

এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি শুনে সত্যেন্দ্রনাথেব চেহাবা সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হযে গেল। বজ্রকঠোব কণ্ঠে তিনি বললেন, "দেখো, আমি জীবনে কোনোদিন অন্যায় করি নি ও কোনো অন্যায় সহ্য করি নি। যতক্ষণ না আমাকে তোমরা বোঝাতে পাচ্ছ যে তোমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত ততক্ষণ আমি রাজী হব না। আমি বিশ্ববিদ্যালয থেকে পদত্যাগ করতে বরং রাজী আছি, কিন্তু তোমাদের অন্যায় দাবি কিছুতেই মেনে নেব না।"

সত্যেন্দ্রনাথের এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক মূর্তি দেখে ইউনিয়নের নেতারা আর কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সত্যেন্দ্রনাথের দৃঢ়মূল সত্যনিষ্ঠার আর একটি আকর্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে। ঘটনাটি ১৯৫২ সালের। দিলীপকুমারের মামাতো ভাই ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার একদিন দেড় হাজার

টাকা নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কাছে এসে বললেন, তাঁর (সত্যেন্দ্রনাথের) চীন যাবার টাকা জোগাড় করে এনেছেন, এবার তাঁকে যেতে হবে।

এই সময় ভারত থেকে একটি শিক্ষক প্রতিনিধি দল চীন পরিদর্শনে পাঠাবার প্রস্তাব হয় এবং ডাঃ মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথকে এই দলে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ সে-সময় কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, যেতে পারেন। সেই কথাতেই ডাঃ মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথের যাবার খরচ বাবদ দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

যদিও সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে যেতে পারেন বলে ডাঃ মজুমদারকে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন শুনলেন মাত্র সাত দিনের জন্যে এই ভ্রমণ ব্যবস্থা এবং ফিরে এসে চীন দেশ সম্বন্ধে 'প্রত্যক্ষদর্শী'র বক্তৃতা দিতে হবে, তখন তিনি যেতে অসম্মত হলেন। বললেন—"আজকাল যাঁরা সাত দিনের জন্যে বিদেশে গিয়ে সেখানকার বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরে এসেই লেকচার দিতে শুরু করেন, তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ নেই আমার। ওদের ভাষা জানি না, মেজাজ জানি না, কিছুই জানি না—গিয়ে কি দেখে আসব মাথামুণ্ডু? দু চারটে সভায় এর ওর সঙ্গে দেখা হবে এই তো! এতে করে কি একটা দেশের নাড়ী-নক্ষত্র জানা যায়?...আগে বলেছিলাম, যেতে পারি। এখন দেখছি যে, যেতে পারি নে।"

ব্যক্তিগত বা নিজের পরিবারের কারো সুযোগসুবিধার জন্যেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সত্যনিষ্ঠার আদর্শ থেকে কোনোদিন বিচ্যুত হন নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্যে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ও খড়গপুরের আই আই টি-তে ভর্তির আবেদনপত্র পেশ করে, সত্যেন্দ্রনাথ তখন কোনো কাজ উপলক্ষে বিদেশ যাত্রা করেন। কিন্তু যাত্রার পুর্বে তিনি শিবপুরে বা খড়গপুরে পরিচিত কাউকে তাঁর পুত্রের ভর্তির ব্যাপারে কিছু বলে যান নি। অথচ শিবপুর ও খড়গপুর উভয় স্থানেই সত্যেন্দ্রনাথের পরিচিত বহু অধ্যাপক ছিলেন। পরে তাঁর সহকর্মীরা এ-বিষয়টি জানতে পেরে নিজেরাই বলাবলি করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে কাউকে কিছু করতে হয় নি, কারণ তাঁর পুত্র নিজের যোগ্যতাতেই শিবপুরে ভর্তি হতে পেরেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার কয়েক মাস পূর্বে ডঃ সুধীন ঘোষকে কেন্দ্র করে সেখানে যে দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন অনেকের বিরাগভাজন হয়েও তিনি সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নি। তাই শান্তিনিকেতনে তাঁর বিদায়-সভায় একজন বক্তা যখন স্থানকাল ভুলে তাঁর সম্পর্কে দু একটি অসতর্ক উক্তি করেছিলেন, তখন সত্যনিষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন—"কারো ওপর আমার বিদ্বেষ নেই, রাগ নেই, কারো সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। আমি কারো অনিষ্ট চিন্তা করি নি। যা সত্য বলে মনে হয়েছে তা-ই করার চেষ্টা করেছি।" সেদিনের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের এই সত্যনিষ্ঠ মর্মোক্তি আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো উৎসারিত হয়েছিল।

সত্যনিষ্ঠার মতো সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ের মহানুভবতাও তাঁর চরিত্রকে মাধুর্য-মণ্ডিত করেছে। তাঁর মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় নানা ঘটনায় ছড়ানো আছে। দু একটি ঘটনা যা শুনেছি বা দেখেছি, এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের জনৈক অধ্যাপক স্বীয় বিষয়ে পড়াতেন খুব ভালোই, কিন্তু মাঝে মাঝে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতেন এবং কখনও কখনও চিৎকার করে উঠতেন। এই অপরাধে তাঁকে চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়। তাঁর এই অপসারণের কথা সত্যেন্দ্রনাথের কানে (তিনি তখন স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ) যেতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য তাঁর সহপাঠী ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কথা বলে এমন একটা ব্যবস্থা করে দেন, যাতে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকার পরিবর্তে মাসিক ৩০০ টাকা তিনি পেতে পারেন। সত্যেন্দ্রনাথের মহানুভবতার ফলে এভাবে অধ্যাপকের জীবন-নির্বাহের একটা সুরাহা হয়!

১৯৩৩-৩৪ সালের ঢাকা শহর। সন্ত্রাসবাদী স্বদেশী আন্দোলনে ঢাকা তখন আলোড়িত। সেখানকার যুবকদের কিছুতেই শাসনে আনতে পাচ্ছিলেন না কর্তৃপক্ষ। বহু যুবককে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে জেলে পুরে রাখা

হলো। তবু কর্তৃপক্ষের চোখে ঘুম নেই। গোরা সৈন্য নিয়ে আসা হলো, যদি কিছু সুরাহা হয়।

এদিকে একটা অদ্ভুত অসহায়তায় সারা শহর তখন আচ্ছন্ন। তরুণদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। পড়ায় মন বসানো প্রায় অসম্ভব। ছাত্রদের মন চাইছিল—কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু সেটা যে কি, তা ভেবে ঠিক করা যাচ্ছিল না। এমন সময় বিহার থেকে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের খবর এলো। হাজার হাজার লোক নিরাশ্রয় গৃহচ্যুত হয়ে চরম দুর্বিপাকে দিন কাটাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেদের দুঃখলাঞ্ছনা খানিকটা ভুলে থাকবার জন্যেই যেন ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে চাঁদা তুলতে এগিয়ে এলো।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। ছাত্ররা তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন জানালো। তিনি পঞ্চাশ টাকা তাদের দিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, "চাঁদা যে তোলা হচ্ছে তা আমি জানি—এটা আমারই পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। পড়াশোনার ক্ষতি করে তোমাদের আবার আসতে হলো। ভালো কথা, কত টাকা তোমরা পাঠাবে?"

ছাত্ররা জানালো, "আমরা এক হাজার টাকা তুলতে চাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "পারবে কি অত টাকা তুলতে? তবে এর জন্যে আবার গানবাজনার আয়োজন করো না যেন। ওটা আমার পছন্দ নয়। দেশের এত বড় বিপদ—এমনিতেই সকলের দেওয়া উচিত।"

আনুমানিক ১৯৩৯ ৪০ সালের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা হলের প্রভোস্ট। সেবার গরমের ছুটির সময় ঢাকা শহরে আরম্ভ হলো প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা হলের বিরাট ছাত্রাবাসের দ্বার খুলে দিলেন দাঙ্গা-নিপীড়িতদের জন্যে। আশেপাশের হিন্দু মেয়েরা বাচ্চাকাচ্চা সহ আশ্রয় নিলো ছাত্রাবাসে—সংখ্যায় প্রায় তিন চারশো প্রাণী। শুধু থাকা-খাওয়াই নয়, সকলের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্বও নিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। নিজেই ঘুরে ঘুরে সব কিছুর তদারক তদ্বির করতেন। প্রায় দেড় দু মাস এই অবস্থা চলেছিল।

একদিন পদার্থ বিভাগের চাপরাশী আলাদিন এসে সত্যেন্দ্রনাথকে বললো, এবার আর তার বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঘর থেকে বার হওয়া অসম্ভব,

অথচ হাতে একটাও পয়সা নেই। না খেয়েই তাকে সপরিবারে মরতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ তার হাতে তিনখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, "তুই বাবা ঘর থেকে আর মোটে বেরুবি না। দেখছিস না, মানুষগুলো সব পাগল হয়ে গেছে। পালা, এক্ষুনি পালিয়ে যা। সাবধানে যাস কিন্তু বাবা।"

আবার ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গার সময়েও দেখেছি, দাঙ্গা-উৎপীড়িতদের সাহায্যের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঙ্গার সময় একদিনের জন্যও তিনি বিজ্ঞান কলেজে আসা বন্ধ করেন নি। ভোর না হতেই সকলের আগে তিনি কলেজে চলে আসতেন।

বিজ্ঞান কলেজের পাশেই রাজাবাজার মুসলমানপ্রধান এলাকা। তার পেছনে নারকেলডাঙা—স্বল্পসংখ্যক হিন্দুর বসতি সেখানে। মুসলিম লীগের শাসনকাল তখন, মুসলমানদের প্রবল প্রতাপ। অনেকেরই আজ জানা নেই যে, সে-সময় সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া এই স্বল্পসংখ্যক হিন্দুদের বাঁচবার আশা ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের তখন একটি মোটর গাড়ি ছিল। সেটিকে উপদ্রুত এলাকায় প্রায়ই দেখা যেত। আর উনি অস্থির মন নিয়ে গেঞ্জি গায়ে খালি পায়ে পায়চারি করতেন বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায়। একদিন কিছু একটা সাহসের কাজ করেছিল একটি ছাত্র। উনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সেদিন বলেছিলেন, "ওরে, জ্ঞানীগুণী আমি অলিতে গলিতে পাই, কিন্তু সাহসী ছেলে আমার কই।"

সত্যেন্দ্রনাথ আবাল্য স্বদেশপ্রেমিক। যদিও স্বদেশী আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ছাত্রাবস্থা থেকেই পরোক্ষভাবে দেশপ্রেমের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদেশী অধ্যাপকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে যেমন এগিয়ে এসেছিলেন, পরবর্তী কালে তেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের পরোক্ষভাবে সাহায্যও করেছেন।

এই প্রসঙ্গের একটি অজানা কাহিনী জানা গেছে ডঃ সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। অবনী মুখোপাধ্যায় নামে সুনীতিকুমারের এক বিপ্লবী বন্ধু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা থেকে গোপনে বাংলা দেশে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। যে জাহাজে এই অস্ত্রশস্ত্র আসছিল তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে তিনি ভারত থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের আয়োজন ব্যর্থ হয় এবং তিনি ধরা পড়ে যান। আপিলবিহীন একটি সংক্ষিপ্ত বিচারে তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। ফাঁসীর জন্যে তিনি যখন অপেক্ষা করছিলেন, তখন কোনো উপায়ে তিনি ভারত ছেড়ে সুমাত্রায় পালিয়ে যান। সুমাত্রা ও জাভায় কয়েক বছর তিনি ছদ্মবেশে রাবার শিল্পের খামারে কুলীর কাজ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই তিনি হল্যাণ্ডে পালিয়ে আসেন এবং তারপর জার্মানীর ভেতর দিয়ে রাশিয়ায় গিয়ে হাজির হন। রুশ বিপ্লবকালে তিনি রাশিয়াতে ছিলেন এবং পরবর্তী কালে আমেরিকায় চলে আসেন। ১৯২২ সালে সুনীতিকুমার যখন কার্যোপলক্ষে বার্লিনে উপস্থিত হন, তখন ঘটনাচক্রে অবনী মুখুজ্জের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়।

অবনী মুখুজ্জে তখন সুনীতিকুমারকে বলেছিলেন, সুযোগ পেলেই তিনি আবার ভারতে ফিরে এসে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করবেন। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি সত্যি সত্যি আবার ভারতে উপনীত হলেন। কলকাতায় পৌছেই তিনি সুনীতিকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তাঁর মাথার উপর পুলিসের পুরস্কার ঘোষণা ছিল এবং গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পারলে তাঁকে ফাঁসীতে চড়াতেন। তাঁকে লুকিয়ে রাখার জন্যে সুনীতিকুমার তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করেন—সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

এদিকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অবনী মুখুজ্জে বিশেষ কারো কাছে তাঁর বিপ্লবাত্মক কাজের সমর্থন পেলেন না। তখন আশাহত হয়ে তিনি আবার ভারত ছেড়ে জার্মানীতে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়লেন। তাই সুনীতিকুমারকে একটি চিঠি লিখে জানালেন, তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য পাঠালে বিশেষ উপকার হয়। সুনীতিকুমার তাঁর ভায়েদের এ কথা জানালে তাঁরা কিছু অর্থ সাহায্য পাঠাতে চাইলেন।

এই সময় (১৯২৪-২৫ সাল) সত্যেন্দ্রনাথ জার্মানীতে আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যাচ্ছিলেন। অবনী মুখুজ্জেকে দেবার জন্যে তাঁর হাতে ভায়েদের প্রদত্ত অর্থ দেওয়া হলো। সত্যেন্দ্রনাথ বার্লিনে গিয়ে তাঁর হাতে এই অর্থ যথারীতি পৌছে দিয়েছিলেন। যে দুঃসাহসের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সহানুভূতি সুপরিস্ফুট।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের আরও দু একটি মনোজ্ঞ ঘটনা শুনেছি স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক অধ্যাপক সমর গুহ'র কাছে। পরাধীনতার যুগে ঢাকা ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার প্রধান রিক্রুটিং সেণ্টার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কত ছাত্রের জেল দ্বীপান্তর, এমন কি ফাঁসীও হয়। এই বিপ্লবী দুরন্ত ছাত্ররা ছিল অধ্যাপক বসু ও ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের গভীর ভালবাসার ধন। তাঁরা অর্থ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে তাদের প্রেরণা জোগাতেন। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অভয় আশ্রমের কর্মীরাও তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য পেতেন।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বদেশ থেকে পালিয়ে যাবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা মুখপত্র 'শতদল'-এ তার একটি ছবি ছাপা হয়। তাই নিয়ে পুলিশমহলে তোলপাড় শুরু হয়। অধ্যাপক বসু তখন নিজে সব কিছুর দায়িত্ব নিয়ে ছাত্র-সম্পাদককে রেহাই দেন। ১৯৪২ সালে ছাত্ররা জেদ ধরে যে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ঢাকা হলে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা তোলা হবে। ছাত্রদের এই দাবিতে অন্যান্য অধ্যাপকদের মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ঢাকা হলের তদনীন্তন প্রভোস্ট অধ্যাপক বসু নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিজের উপর নিয়ে সরকারী কোপ থেকে ছাত্রদের বাঁচিয়ে দেন।

নেতাজী বার্লিন থেকে প্রথম যে বেতারভাষণ দেন তার অনুলিপি গৃহীত হয় ঢাকায় অধ্যাপক বসুর গবেষণাগারের উচ্চশক্তিসম্পন্ন বেতারযন্ত্রের সাহায্যে। সেই বেতারভাষণ ঢাকায় ছাপা হয়ে সারা ভারতে প্রচার লাভ করে ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এত বড় গুরুতর ঘটনার কথা শুনে অধ্যাপক বসু হেসেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুনেও যেন শোনেন নি।

এই দেশপ্রেমের প্রেরণায় সত্যেন্দ্রনাথ দেশবিভাগের সময় অতুলচন্দ্র গুপ্তের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে দিনের পর দিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে তথ্য পেশের কাজে সাহায্য করেছিলেন—সেখানেই খেয়েছেন, শুয়েছেন, সারাদিন কাটিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ নানাজনকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করেন। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতির কথা চিন্তা করেই তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আজও নিরলস প্রয়াস করে চলেছেন।

বিজ্ঞানীরা জটিল নিরস বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান বলে সাধারণ লোকের ধারণা তাঁরা বুঝি 'রসকষহীন' গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যদিও প্রথমত ও প্রধানত বিজ্ঞানী, তবে মোটেই গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোক নন। তিনি অত্যন্ত পরিহাসপ্রিয়—নিজে যেমন পরিহাস করতে পারেন, তেমনি অপরের পরিহাসও উপভোগ করতে পারেন।

বাঙালী যুবকদের ক্ষীণ দেহ দেখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তিনি এ কথা প্রায়ই ছাত্রদের শোনাতেন। একবার গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে কার্মাটারে বেড়াতে গিয়ে সাঁওতালদের বলিষ্ঠ দেহ দেখে তিনি পরম আনন্দিত হন। তাই সেখান থেকে ফিরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখদের তিনি বললেন, "তোরা সাঁওতাল মেয়েদের বিয়ে কর। তা হলে তোদের যে সন্তান হবে, তারা তোদের মস্তিষ্ক ও তাদের দেহ নিয়ে জন্মালে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।"

সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুললেন, "আর যদি আমাদের দেহ ও তাদের মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায়?"

শিষ্যের এই তীক্ষ্ণ পরিহাস শুনে আচার্য রায়ও না হেসে পারেন নি।

একদিন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিজ্ঞান কলেজে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত। আসার উদ্দেশ্য একটি বিশেষ বিষয়ে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে আলোচনা—সংখ্যা কি তার যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করা।

সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মশাইকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর তাঁকে

চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করে বললেন, "আমি আর কি আলোচনা করবো, সব ভুলে-টুলে গিয়েছি। এই আমার ছাত্ররা রয়েছে—তারা আলোচনা করুক, আমি শুনবো।" এই বলে ছাত্রদেব দিকে চেয়ে বললেন, "বল্ তোরা—সংখ্যা কি ?"

আলোচনা শুরু হলো। ছাত্রদেব মধ্যে একজন বারট্রাণ্ড রাসেলের সংখ্যা সম্পর্কিত সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত কবে বললো—"The number of a class is the class of all those classes that are similar to it"। ছাত্রটি এই দুর্বোধ্য সংজ্ঞাটির মর্মার্থ না বুঝেই এটি উদ্ধৃত কবেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ সেটা উপলব্ধি কবেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত মশাযের সামনে এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেন নি।

কিন্তু পণ্ডিত মশাই চলে যাবাব পব আবাব যখন ঘুবেফিবে সংখ্যাব সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো, তখন সত্যেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "কেন একটু আগে তো অমুক কথাটা পবিষ্কাব কবে দিযেছে।" বলেই সজোবে টেবিল চাপড়ে বললেন—"Class of a class of a class of a class।"

শান্তিনিকেতনে থাকাকালে সত্যেন্দ্রনাথ একদিন ষোড়শ শতাব্দীব ফবাসী ইতিহাস সম্পর্কিত একটি বই পড়ছেন। এমন সময় দেখা করতে এলেন সুসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কব। সত্যেন্দ্রনাথ এই ইতিবৃত্তের একটি মজার কথা তাঁকে বসিয়ে রসিয়ে বললেন—"সেণ্ট বার্থোলোমিউ দিবসেব হত্যা-বিভীষিকায় হাজার হাজার প্রোটেস্টাণ্ট কচুকাটা হয। ক্যাথলিকদের এই অতর্কিত আক্রমণেব পিছনে ছিল বাষ্ট্র, স্বযং রাজমাতা যাব কর্ণধার। ইংলণ্ডের বানী এলিজাবেথ এই নিয়ে বাগ কবে চিঠি লিখলে ফ্রান্সের বাজমাতা ক্যাথরিন দ্য মেদিসি জবাব দেন, তাতে হযেছে কী। তোব যদি এত মনে লাগে তুইও তোর বাজ্যের ক্যাথলিকদের বিনাশ কর।"

এদেশে দার্শনিকতাব প্রাবল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ একদিন আমাদেব একটি বসোত্তীর্ণ গল্প শুনিয়েছিলেন।—

"বশিষ্ঠ ঋষি চিরকাল বলতেন যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। রাজা দিলেন তাঁর পেছনে হাতী দিয়ে তাড়া। বশিষ্ঠ অবশ্য টিকি না বেঁধেই দৌড়তে আরম্ভ করলেন। তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, একি ? মহামুনি, আপনি

যাচ্ছেন .কোথায় ? কিছুই তো নয়, এ তো সব মিথ্যা। ঋষি এর উত্তরে বললেন, আমি যে যাচ্ছি এটাও তো মিথ্যা।"

এমনিধারা রসজ্ঞ কৌতুক-কাহিনী সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় রসিয়ে রসিয়ে অনেককে বলেন।

এক সংবর্ধনা সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত। প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সেদিন পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন, "প্রফুল্লচন্দ্র অতীতে কতই না সমাজ সেবার কাজ করেছেন, আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসেছেন। অবশ্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে, মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কথা মনে রাখেন নি। 'কলির কেষ্ট' সম্বন্ধে সম্ভবত সে কথাটা খাটে না।" সত্যেন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে এই উক্তিটি করলেও কথাটি গভীর অর্থব্যঞ্জক।

একদিন গোঁফ কামাতে গিয়ে নাপিত সত্যেন্দ্রনাথকে বলছে, "বাবু, চোখ সামলান।"

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "সে কি রে! নাক বল।"

নাপিত বললো, "নাক তো যাবেই, চোখ সামলান।"

একবার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভার শেষে সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কলেজের সন্নিকটস্থ ফেডারেশন হল থেকে নিজের বাড়িতে ফেরবার উদ্যোগ করছেন।

আমরা বললুম, "মাস্টার মশাই, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করি।"

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "না, গাড়ির দরকার নেই। রিকশাতে যাব। বেশ হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যাবে (তখন গ্রীষ্মকাল, সেদিন সন্ধ্যায় আরাম-দায়ক ফুরফুরে হাওয়া বইছিল)।" বলেই তিনি নিজেই একটা রিকশা ডেকে উঠে বসলেন।

আমাদের মধ্য থেকে একজন তখন বললো, "আপনার সঙ্গে একজন কেউ যাক।"

সত্যেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "জায়গা হবে না। দেখছ না, সব জায়গাটা

আমি একাই (নিজের স্থূল-চেহারার ইঙ্গিত করে) দখল করে নিয়েছি। অন্য একজন বসবে কোথায় ?"

আর একদিন সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কলেজ থেকে বাড়ি যাবার জন্যে এক রিকশাওয়ালাকে ডাকছেন। ওঁর গায়ে সেদিন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ছাপমারা এক বিচিত্র পোশাক। (সে বিচিত্র পোশাক দেখেই বোধ হয়) রিকশাওয়ালা যেতে রাজী হলো না।

সত্যেন্দ্রনাথ তার মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করে হেসে বললেন, "আমার চিত্রবিচিত্র পোশাক দেখে লোকটা বোধ হয় ভড়কে গেছে। ভেবেছে হয়তো এই সাওয়ারীর মাথার ঠিক নেই, তার কাছ থেকে ভাড়া আদায় করা যাবে না। তাই যেতে চাইছে না।"

সত্যেন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের এই কৌতুক ও পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি কাছের মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের সহজ সরল অমায়িক চরিত্রের পরিচয়।

আমাদের বাড়িতে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকার' একটি পুরনো সংস্করণ দীর্ঘকাল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সেজন্যে মা এই পঁচিশ খণ্ডের বইগুলিকে বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে দেবার জন্যে বলছিলেন।

মাস্টার মশাইকে একথা যখন বলতে গেলুম, তিনি বললেন—"আমার এনসাইক্লোপিডিয়া নেই, আমাকে দে। আমি বাঁধিয়ে রাখব।" তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "বইগুলো কার ?"

আমি বললুম, "বাবার।"

মাস্টার মশাই বললেন, "তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস্ কত দাম দিতে হবে ?"

বাবাকে এ কথা বলাতে তিনি বললেন, "প্রফেসার বোস নিজে যখন বইগুলো চেয়েছেন তখন দাম নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"

মাস্টার মশাইকে একথা জানাতে তিনি বললেন, "তোর বাবাকে একদিন তা হলে ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে হবে।"

যেদিন মাস্টার মশাইকে এই পঁচিশ খণ্ড বই দিতে গেলুম, সেদিন তিনি কি খুশীই না হলেন। তাঁর ছোট মেয়ে খুকুকে ডেকে বললেন, "খুকু, ত্যাখ রবির বাবা আমাকে কত বই দিয়েছেন।"

এই বইগুলি বহু ব্যয়ে বাঁধিয়ে মাস্টার মশাই সযত্নে তাঁর ঘরে রেখেছিলেন।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাঙ্গালোরে আয়োজিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে যাব বলে স্থির করেছি। মাস্টার মশাইকে যখন সে-কথা বলতে গেলুম তিনি বললেন, "তুই তো মহীশূরেও যাবি। আমার জন্যে তা হলে চন্দন কাঠের গুঁড়ো ও চন্দন কাঠের তেল আনবি।"

সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হবার পর বেলুড়, হ্যালিবিড, সোমনাথপুর, শ্রাবণ বেলগোলা ও মহীশূর পরিদর্শন করে কলকাতায় ফিরে এসে একদিন মাস্টার মশাইকে চন্দন কাঠের গুঁড়ো ও তেল দিতে গেলুম। সেদিন এই সামান্য জিনিস পেয়ে তিনি যে কত খুশী হয়েছিলেন!

আমার এক পরিচিত বন্ধু মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে একটি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করে দেবার জন্যে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে। মাস্টার মশায়ের কাছে সসংকোচে সে-কথাটা যখন উত্থাপন করলুম, তিনি শুধু জানতে চাইলেন তার পরিচয়। বন্ধুটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো লিখতে পারত। সে-কথা শুনে তিনি বললেন, "কি লিখতে হবে তুই লিখে দে।" একটা প্রশংসাপত্র টাইপ করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেটা তাঁকে দেখাতে তিনি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাতে সই করে দিলেন।

একবার মাস্টার মশায়ের জন্মদিনে মা তাঁর জন্যে কড়াইশুঁটির কচুরি তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন। মাস্টার মশাই তা খেয়ে তাঁর পুত্রবধূকে বললেন, "বৌমা, রবির মা তোমার চেয়ে ভালো কচুরি করেছেন। খেয়ে ত্যাখো।"

আর একবার সরস্বতী পুজোর দিনে আমার এক বোন মাস্টার মশায়ের হাত দিয়ে তার ছেলের হাতেখড়ি দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল।

সংকোচবশে আমি সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারি নি। বলেছিলুম, "হাতেখড়ি বাড়িতে হবার পর মাস্টার মশাইকে প্রণাম করাতে তাকে নিয়ে যেতে পারি।"

মাস্টার মশায়ের কাছে ভাগনেকে নিয়ে গিয়ে যখন বোনের আকাঙ্ক্ষার কথা জানালুম, তিনি হেসে বললেন—"শ্লেট কই, খড়ি কই ?"

আমি বললুম, "ওর হাতেখড়ি বাবা দিয়েছেন, ও আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছে।"

মাস্টার মশাই তখন সস্নেহে ভাগনেব মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "তোমার নাম কি ?" ওর মুখে 'জ্ঞানব্রত' নাম শুনে খুশী হয়ে বললেন, "খুব ভালো নাম।" তারপব পরম আদরে ওকে মিষ্টি খেতে দিলেন।

মাস্টাব মশায়ের পাশেব বাড়ির ঘণ্টু নামে একটি ছোট ছেলে তাঁব ঘবে প্রাযই আনাগোনা করে। সেবাব সংযুক্ত আবব প্রজাতন্ত্রেব আমন্ত্রণে কাইবো যাবাব আগে একদিন ঘণ্টু এসে তাঁব কাছে আবদাব জানালো, "দাদু, আমাব জন্যে কি আনবে ?"

মাস্টাব মশাই বললেন, "তোর জন্যে একটা কলম আনবো।" কিন্তু কাইরোতে গিযে কাজের মধ্যে সে-কথা তাঁর আব মনে থাকে নি।

কলকাতায় তিনি ফিরে আসার পর একদিন তাঁব সঙ্গে যখন দেখা করতে গেছি মাস্টার মশাই তখন বললেন, "ওবে, একটা বড়ো ভুল হয়ে গেছে। ঘণ্টু বাবুর জন্যে কলম আনা হয় নি। ওব জন্যে একটা কলম জোগাড করে দে।"

সেই অনুযায়ী একটা রঙচঙে বড়ো কলম এনে মাস্টার মশাইকে দিলুম। উনি ঘণ্টুকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন।

দাদুর ডাক শুনে ঘণ্টু ছুটে এলো। মাস্টার মশাই তাকে কাছে টেনে বললেন, "এই নাও তোমার কলম। এবার খুশী তো ?"

কলম পেয়ে ঘণ্টু যত খুশী, ঘণ্টুকে তার মনোমতো জিনিস দিতে পেরে মাস্টার মশাইও তেমনি খুশী।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে একবার সত্যেন্দ্রনাথ এসেছেন। সে-অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি বা প্রধান অতিথি নন, ছেলেমেয়েদের গান-বাজনা শোনবার জন্যে এসেছেন। ছেলেরা সভাপতি ও প্রধান অতিথির জন্যে

মালা আনিয়েছিল, ওঁর জন্যেও যে একটা মালা আনা দরকার সেটা তাদের খেয়ালই হয় নি। তাই সভার শেষে ছেলেরা সেটা যখন বুঝতে পারলো, তখন ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে গেল কয়েকটা গোপাল ফুল নিয়ে। তিনি ছেলেদের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন এমনভাবে যেন একটা মজার কথা শুনছেন। বললেন, "আমি তো তোমাদেরই একজন। তোমাদের দাদুর মতন হয়ে এখানে এসেছি। আমাকে কি আবার ঘটা করে মালা দিতে আছে?" এই বলে আদর করে ছেলেদের একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তিনি ছেলেদের হাতের ফুলগুলি নিয়ে একটি একটি করে তাদেরই জামায় লাগিয়ে দিলেন।

এমনি আরও কত ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সহজ সরল চরিত্রমাধুর্যের পরিচয় পেয়েছি তা বলে শেষ করা যায় না।

বয়োজ্যেষ্ঠরা অনেক সময় বলেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ ছোটদের সঙ্গে যত সহজে মিশে যান বড়োদের সঙ্গে তেমন যেন মেশেন না। কথাটা বোধ হয় ঠিকই। সত্যেন্দ্রনাথ শিশুর মতোই সহজ সরল, তাই বয়োকনিষ্ঠদের সঙ্গে একেবারে সহজভাবেই তিনি মিশে যান।

সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হলেও তাঁর মেজাজটা কিন্তু একেবারে বাঙালী মেজাজ। বৈঠক পেলে যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ঢাকায় বৈঠকে বসে তাস, দাবা খেলায় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেতে থাকতেন বলে শুনেছি। বৈঠকে বসলে তিনি অন্য এক মানুষ হয়ে যান। সে-সময় তাঁর কথায় বিজ্ঞানের জটিলতা বা জ্ঞানের তত্ত্বকথা বিন্দুমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন বৈঠকের আর পাঁচজনের একজন বলেই তাঁকে মনে হয়।

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে দ্বিতীয় দফায় অধ্যাপনাকালে তিনি তাঁর ঘরে প্রায়ই ছাত্রদের নিয়ে খবরের কাগজ বিছিয়ে মুড়ি তেলেভাজা খেতেন। একদিন এইরকম খাওয়া যখন চলছে, এমন সময় একজন মহারাজা বাহাদুর ও একজন বাঙালী সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

মাস্টার মশাই তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন মুড়ি খাবার জন্যে।

মহারাজা বাহাদুর অল্প মুড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মুখে তাঁর মৃদু হাসি।

বাঙালী সাহেবটি কিন্তু মুড়ি স্পর্শ করলেন না। বললেন, "আমি স্ট্রার দোকানের খাবার খাই না।"

সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার মশাই বলে উঠলেন, "দোকান কোথায় হে, ওই যে গেটের কাছে ফুটপাতে বসে ভাজছে। একেবারে গরম, খাও, খাও, কিছু হবে না।"

শুধু মুড়ি তেলেভাজা নয়, সাধারণ 'ভোজনবিলাসী' বাঙালীর মতো সত্যেন্দ্রনাথ এক সময় রীতিমতো খেতে পারতেন ও খাওয়াতে ভালবাসতেন। যখন তিনি খেতে পারতেন, তখন রান্নার নতুন বামুনঠাকুর কাজে বহাল করার সময় বলতেন, "আগে রান্না করে খাইয়ে দেখাও কি কি রাঁধতে পার ও কেমন রাঁধতে পার। তোমার হাতের রান্না খেয়ে পছন্দ হলে তবেই তোমাকে রাখা হবে।"

নিজের খাওয়া নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক থাকাকালে তিনি যখন ভোর থেকেই কলেজে চলে আসতেন, তখন সেখানেই আহারপর্ব সমাধা করতেন। যে ছাত্রটি তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করত, একদিন হয়তো তিনি তাকে বললেন, "আজ খিচুড়ি চাপিয়ে দাও—গোটা দুই ডিম ওতে ছেড়ে দিও।"

পরের দিন ছাত্রটি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে গেল, "আজও কি খিচুড়ি হবে?"

মাস্টার মশাই বললেন, "হতে পারে, কিন্তু কালকের মতো নয়। ভেবে দেখলুম, কালকের খিচুড়িটা ব্যালেনসড্ ডায়েট হয় নি। আজ চাল ডাল দাও, সেইসঙ্গে কিছু শামুক গুগলি।"

শামুক গুগলির কথা শুনে ছাত্রটি একটু হকচকিয়ে গেল।

তা দেখে মাস্টার মশাই হেসে বললেন, "ওকি, হাঁ করে রইলে কেন? শামুক গুগ্‌লি খাওয়া যায় না? তুমি কিছু জানো না। বাংলা দেশে রয়েছ বটে, কিন্তু তুমি দেখছি সত্যিকারের বাঙালী নও। তোমাদের অনেক আগে থেকে যারা এদেশে রয়েছে—সাঁওতালরা, তারা ওটা খায়। তাদের কিরকম তাগড়া তাগড়া-চেহারা দেখছ? নাও, চাপিয়ে দাও—বেশ খাওয়া যাবে।"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই শামুক গুগ্‌লিসমন্বিত খাদ্য আর খাওয়া হয় নি।

তবে রাজাবাজারের দোকান থেকে শিক-কাবাব ও অন্যান্য মুখরোচক খাদ্য আনিয়ে মাস্টার মশাই মাঝে মাঝে মুখ বদলাতেন।

একসময় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 'চেন-স্মোকার'। বিজ্ঞান কলেজে তাঁর অধ্যাপনাকালে দেখেছি একদিকে তিনি যেমন খাতায় পাতার পর পাতা অঙ্ক কষে চলেছেন, সেইসঙ্গে একটার পর একটা সিগারেটও শেষ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে আবার দেখেছি, ধূমপান একদম ছেড়েও দিয়েছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনসম্ভোগে ধূমপান যেমন আছে, তেমনি আছে চা, পান, জর্দাও।

আহারের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি পোশাকপরিচ্ছদের ব্যাপারেও সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্রপন্থী। কেতাদুরস্ত সাজপোশাকে তিনি কোনোদিনই অভ্যস্ত নন। নানা সময়ে নানারকম পোশাক পরতে তাঁকে দেখেছি। বাড়িতে লুঙ্গি, বাইরে যাবার সময় লম্বা পাজামা বা চুড়িদার পাজামা। গ্রীষ্মকালে বুশ সার্ট বা মির্জাই (একধরনের ফাঁস-দেওয়া জামা), শীতকালে জামার উপর লংকোট বা জোব্বা এবং সেই সঙ্গে মাথায় একটা পশমের টুপি (যেরকম টুপি এন সি সি-র ছেলেরা আজকাল পরে থাকে)। কোনো উপলক্ষ ঘটলে একেবারে খাঁটি বাঙালী পোশাক ধুতি পাঞ্জাবি চাদর। আবার বিদেশযাত্রার সময় কোট প্যাণ্ট টাই।

বড়ো বড়ো সভাসম্মেলনে সভাপতি বা সম্মানিত অতিথি হিসাবে যোগদানের সময়েও তিনি কেতাদুরস্ত পোশাক না পরে উপরোক্ত রকম পোশাকেই সাধারণত উপস্থিত হন। তাঁর মতো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির এরকম বিচিত্র পোশাক দেখে অপরিচিত জনেরা অনেক সময় অবাক হয়ে যান। জব্বলপুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে অনুষ্ঠানমঞ্চে তিনি যে বিচিত্র পোশাকে উপস্থিত হয়েছিলেন তা দেখে অনেকে আমাকে এ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করেছিলেন। জাপানে 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যখন যান, তখন লুঙ্গি পরেই সর্বত্র ঘোরাফেরা করতেন বলে শুনেছি।

সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন কাছের মানুষ তেমনি তিনি দূরেরও। কাছের মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ একেবারে সহজ সরল আপনভোলা প্রাণখোলা মাটির মানুষ।

তখন তাঁকে মনে হয তিনি আমাদেব মহা-আপন। আবাব যখন তিনি কোনো গাণিতিক সমস্যাব সমাধানে আত্মসমাহিত থাকেন, তখন তাঁর দিকে তাকিযে মনে হয়েছে তিনি যেন এ জগতেব মানুষই নন--এক অনাসক্ত যোগী যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে বয়েছেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভীড থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয বলেই বোধ হয তিনি তখন অনাসক্ত হযে পড়েন। সে-সময় কেউ কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও তাঁব খেযাল থাকে না। অসতর্ক মুহূর্তে কোনো কোনো বার তাঁব কাছে যখন উপস্থিত হযেছি, তখন আমাদের উপস্থিতি কোনোক্রমে তাঁব দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলে ওঠেন, "পালা, পালা।"

তাঁব এই 'পালা, পালা' সম্বোধন শুধু আমবা যাবা বযোকনিষ্ঠ তাদেব প্রতি উচ্চারিত হয না, বয়স্ক বন্ধুবান্ধব অন্তবঙ্গ সকলেব প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এবং যাঁবা তাঁব এই কথাটিব সঙ্গে পরিচিত, তাঁবা জানেন এব অর্থ কি। তাই এ-কথা শোনাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধব ছাত্রছাত্রীবা আর বাক্যব্যয না কবে চলে যান।

নিতান্ত অপবিচিতজনেব কাছে সত্যেন্দ্রনাথেব এ ধরণেব কথা একটু 'রূঢ' শোনাতে পাবে, কিন্তু যাঁবা তাঁকে চেনেন তাঁবা জানেন তিন ভর্ৎসনাব সুরে বা রূঢভাবে এ-কথা উচ্চাবণ কবেন না। কাবণ কাউকে আঘাত করে কোনো রূঢ কথা বলা তাঁর স্বধর্মেব বিবোধী।

একবাব আমাব একটি প্রবন্ধে আইনষ্টাইন ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একটি মারাত্মক ভুল উক্তি করেছিলুম। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবাব কযেকদিন পবে কোনো কাজ উপলক্ষে তাঁব কাছে যেতে তিনি সস্নেহ ধমক দিযে শুধু বলেছিলেন, "যা তা কি সব লিখেছিস্। আর কখনও এসব কথা লিখবি না।" অথচ উক্তিটি এত ভ্রমাত্মক ছিল যে তিনি অনায়াসেই লেখককে রীতিমতো ভর্ৎসনা কবতে পারতেন।

সত্যেন্দ্রনাথেব সতত-চিন্তাশীল মনে চেতন ও অবচেতন সত্তার এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। এ-কাবণে যদিও তিনি স্বভাবতই স্নেহশীল দরদী, তবু কোনো কোনো অবচেতন মুহূর্তে তাঁর আচরণে যা প্রকাশ পায় তাতে হয়তো মনে হতে পাবে সেটা বুঝি তাঁর নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য।

কাউকে কোনো কাজের জন্যে তিনি নিজেই হয়তো ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সে-লোকটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখলো, তিনি একটি খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে অঙ্ক কষায় এমন আত্মমগ্ন হয়ে রয়েছেন যে তাকে দেখেও যেন দেখলেন না! তিনি নিজেই যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে-কথা তখন আর তাঁর খেয়াল নেই! লোকটি (মনে মনে হয়তো আহত হয়ে) অগত্যা কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে চলে যায়।

একবার শান্তিনিকেতনে সত্যেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে [illegible] সময় তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তখন বিশ্ব[illegible] সংগঠনের একটি পরিকল্পনায় এতই নিমগ্ন যে মেয়েকে বা তার বন্ধুদের দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না।

তাঁর বাড়িতে গিয়ে অনেক সময় দেখেছি, তিনি কথা বলতে বলতে হঠাৎ নীরব হয়ে চোখ বুজে বিছানা বা মাদুর সতরঞ্জির উপর দেহ এলিয়ে দেন। তখন তাঁর মনের গতিপ্রকৃতি ধরাছোঁয়া যায় না। তাঁকে দেখে তখন মনে হয়, দেহ তাঁর এখানে থাকলেও মন চলে গেছে কোনো মগ্নচৈতন্যের স্বর্গলোকে।

সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে বা আলোচনা-চক্রে কারো বক্তৃতা শুনতে শুনতে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় চোখ বুজে বসে থাকেন। তখন স্বভাবতই মনে হয়, তিনি বুঝি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন এবং বক্তার কোনো কথা শুনছেন না। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে একবার বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানী নীলস্ বোর বক্তৃতা করছেন। সত্যেন্দ্রনাথ সে-সভার সভাপতি। কিন্তু তিনি চোখ বুজে রয়েছেন। হঠাৎ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বোর একটি গাণিতিক বিষয় ঠিক-ভাবে স্মরণ করতে না পেরে বলে উঠলেন, "অধ্যাপক বোস, এ-ব্যাপারে আমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারেন।" সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ চোখ উন্মিলিত করে তাঁকে বিষয়টি ধরিয়ে দিলেন এবং তারপর আবার চোখ বুজে ফেললেন। বাইরের দিকে তিনি যখন দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে থাকেন, তখন তাঁর মন বোধ হয় চিন্তারাজ্যের গভীরে প্রবেশের বেশী অবকাশ পায়।

সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে উদ্যোগী ভাব কম, একটা বিশেষ মেজাজ বা 'মুড' না এলে তিনি তৎপর হয়ে সচরাচর কিছু করেন না। যখন তিনি মুডে থাকেন,

তখন প্রসঙ্গ উঠলে আপনা থেকেই অনেক কথা বলে যান। আবার অন্য সময়ে কেউ হয়তো কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু দেখা গেল তিনি তাঁর কথা শুনেও বিশেষ কিছু বললেন না।

লেখার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ বরাবরই কম, কিন্তু যখন তাঁর মুড আসে, তখন দিনের পর দিন লিখে চলেন। আবার কখনও কখনও কোনো বিষয় লিখতে লিখতে কয়েকদিন পরে সেটাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখে দেন এবং পরে সেটা আর কোনোদিন বোধ হয় সম্পূর্ণ হয় না।

নিজের কথা তিনি সাধারণত বলতে চান না। এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় তাঁকে বহুবার প্রশ্ন করেও বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। তবে যখন মুড়ে থেকেছেন তখন তাঁর জীবনের কিছু কিছু কাহিনী তিনি আমাদের শুনিয়েছেন।

একদিন আমাদের পরিচিত এক ফটোগ্রাফার তাঁর তোলা সত্যেন্দ্রনাথের একটি ফটোতে স্বাক্ষর করে দেবার জন্যে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন। কথা ছিল, ঐ ফটোর আর একটি কপি সম্পূর্ণ করে তিনি দেখাবেন এবং দুটি কপির মধ্যে যেটি ভালো হবে সেটি সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি উপহার দেবেন। তাই সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "আগে তোমার আর একটা কপি এনে দেখাও, তবে সই হবে।" সেদিন ফটোগ্রাফার বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি ফটো তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঠিক মুডে নেই। বললেন, "আজ নয়, যেদিন তুমি আগের তোলা ফটোর কপিটা নিয়ে আসবে সেদিন হবে।'

ফ্রান্সের এক বিশেষ ধরনের ওডি-কলোন সত্যেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। তবে এই ওডি-কলোনটি সব সময়ে বাজারে পাওয়া যায় না, তাই অনেক সময় তিনি বিভিন্নরকম এসেন্স সংগ্রহ করে মিলিয়ে মিশিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে (রসায়নশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান তো সুগভীর) নিজের মনোমতো ওডি-কলোন তৈরি করে নেন। আবার কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে যদি তাঁর প্রিয় ওডি-কলোনের সন্ধান পেয়ে যান, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেটির সদ্ব্যবহার করতেও তিনি দ্বিধা করেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ আহার-পরিচ্ছদে রুচিতে ও মেজাজে বাঙালী, অথচ মন তাঁর বিশ্বমানবিক। একদিকে তিনি যেমন স্বদেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা উন্মেষের জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়াসে ব্রতী, অপরদিকে ধর্ম সম্প্রদায় ও জাতীয়তার ঊর্ধ্বে তাঁর মন বিস্তৃত। তাই মানুষ সম্পর্কিত তাঁর বক্তৃতায় বা ভাষণে যে সুরটি সাধারণত অনুরণিত হয় তা বিশ্বজনীন—কোনো একটি বিশেষ দেশ বা জাতির মর্মধ্বনি নয়। জাপানে 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে প্রদত্ত তাঁর একটি ভাষণে এই সুরেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—"They (scientists) may.. be able to guide all nations towards a new era, an era when the different nations, though they may be on different levels of material progress, yet ultimately will be united in the common-bond of brotherhood and unity......and if the same feeling of good-will can be cultivated among different nations, as generally is reputed to hold among a brotherhood, we can hope for the best and all our endeavours and our scientific studies may be directed towards a common purpose not only for the good of the motherland but also for the good of the human race" (বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সকল জাতিকে এক নবযুগের সন্ধান দিতে পারেন—যে যুগে বিভিন্ন জাতি বৈষয়িক প্রগতির তারতম্য সত্ত্বেও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।·· এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যদি ভ্রাতৃসুলভ সদিচ্ছা জাগরিত হয়, তা হলে আমরা সুফলের আশা করতে পারি এবং তখনই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন কেবলমাত্র মাতৃভূমির কল্যাণে নয় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হবে)।

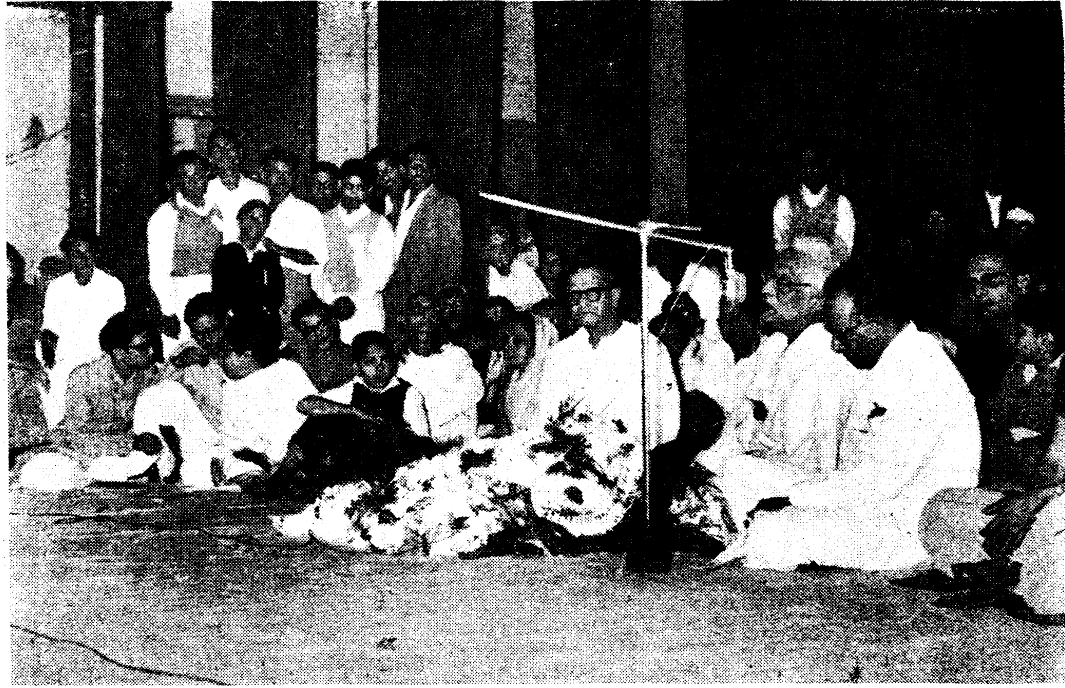
সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে একই সঙ্গে প্রবল বাঙালী অথচ বিশ্বমানব সত্তার যে আশ্চর্য সমন্বয় দেখি তা আমাদের বিস্মিত অভিভূত করে। কিন্তু আমরা যখন চিন্তা করি সেই রেনেসাঁস যুগের কথা—যে যুগ-পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথ লালিত, বর্ধিত ও বিকশিত হয়েছেন, তখন এই সার্বিক ব্যক্তিসত্তা উপলব্ধি করা কঠিন হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ কখনও খণ্ড মানুষ সৃষ্টি করে নি, সৃষ্টি করেছিল পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। সত্যেন্দ্রনাথও সেই যুগের পূর্ণ

মানবতার আলোকে তাঁর প্রাণের দীপ জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বে বিভিন্নমুখী বিকাশ ও স্ফুরণের সমন্বয় ঘটেছে—একাধারে বিজ্ঞানী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগী, সমাজ ও দেশদরদী, বাঙালী অথচ বিশ্বমানব। আর এ-কারণেই তাঁর গভীর মানবপ্রীতি ও চরিত্রমাধুর্যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্বদেশের পার্থিব সমৃদ্ধির প্রসার প্রচেষ্টায় মূর্ত হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলিত সত্তা।

বাংলার নবজাগরণের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যধারা আজ লুপ্তপ্রায়। এই সার্বিক যুগের প্রতিনিধি যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই আজ আমাদের মাঝ থেকে অন্তর্হিত। মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথই এই যুগের শেষ প্রতিনিধি।



বিশ্বভারতীতে একটি আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনীতে 'গুরুদেব' আইনষ্টাইনের প্রতিকৃতি নিরীক্ষণরত সত্যেন্দ্রনাথ



সপ্ততিতম জন্মোৎসবে সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে ভাষণদানরত সত্যেন্দ্রনাথ ঃ
তাঁর দক্ষিণে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, বামে জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীমতী উষাবতী বসু এবং সর্ববামে লেখক।

জীবনদর্শন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন প্রমুখ মনীষীরা তাঁদের নানা লেখায় ও আলোচনায় নিজেদের জীবনদর্শনের কথা যেমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গেছেন, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেভাবে তাঁর জীবনদর্শন কোথাও ব্যক্ত করেছেন কিনা জানি না। তবে তাঁর নানা লেখায় ও ভাষণে তাঁর জীবনদর্শনের ইঙ্গিত আমরা পাই। এরই সাহায্যে তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে আভাস দেবার চেষ্টা করছি, জানি না এ প্রয়াস কতখানি সার্থক হবে। সত্যেন্দ্রনাথের মনীষা ও মানবিকতার কথা ছোট-বড় ঘটনার মধ্যে দিয়ে বলা খুব কঠিন নয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানও সংক্ষেপে সাধারণভাবে আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু জীবনে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি যে বিশ্বাসভূমি গড়ে তুলেছেন তার আলোচনা মোটেই সহজ নয়।

সত্যেন্দ্রনাথ স্বধর্মে বিজ্ঞানী, সে-কারণে স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা করে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস কি। এ-প্রসঙ্গে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তাঁর যে-সব পত্রালাপ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে আমরা এ-বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত পেতে পারি।

ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি দিলীপকুমারের গভীর অনুরাগ আবাল্যকাল এবং পরবর্তীকালে তিনি ভগবৎপ্রেমী সাধকের জীবনই সম্পূর্ণরূপে বরণ করে নেন। সে-বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ একেবারে বিপরীত পথের পথিক—বিজ্ঞানসাধক। কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে এক গভীর অন্তরঙ্গতা ও সৌহার্দ্য বিদ্যমান। এ-প্রসঙ্গে দিলীপকুমার বলেছেন—"সত্যেন মাঝে মাঝে আমাকে স্নিগ্ধ ব্যঙ্গের সুরে হেসে বলত: 'আমার মতন নাস্তিকের দিকে তুই ঝুঁকলি কি করে বল্ তো?' কিন্তু আমি এটুকু বুঝতাম যে সত্যেন সহজে ধরা দেয় না, তাই টুকতাম: 'তুমি কখনোই নাস্তিক নও। সত্যি নাস্তিক হলে তোমার আমার মধ্যে একটা ব্যবধান আসতই আসত।' এ-কথা আজও আমি বিশ্বাস করি, আরো এইজন্যে যে মুখে নিজেকে নাস্তিক বললেও সত্যেন তার চিঠিপত্রে বরাবরই ভাগবত সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাই প্রকাশ করত।

আমাকে একটি চিঠিতে সে লিখেছিল, তোমার সাধনায় যেন তুমি সিদ্ধিলাভ করো।"

দিলীপকুমারকে আর একটি চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন -"সারা জীবন তুমি যে পথে যে সত্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছ আমার কাছে তা অজানা হলেও তোমার সত্যসন্ধিৎসু মনকে তো আমি অবজ্ঞা করতে পারি না। মানুষের মনের সব দরজার খবর কি সকলে পায় ? যে পথে তোমার মনের মধ্যে সঙ্গীতের সুরসুন্দরীরা আসা-যাওয়া করেন, তা তো আমার কাছে চিরকাল গোপন রহস্যই রয়ে গেল। ঐকান্তিক সাধনার প্রসাদে তুমি যে সিদ্ধির পথে এগোবে, এ আমি বিশ্বাস করি। এদেশের বাতাসে ও ধূলিকণায় মিশে আছে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির স্মৃতি। মরমী খবর সব সময়েই এদেশের মনকে অদ্ভুতভাবে দোলা দেয়। অবশ্য সকলে তো অধিকারী নয় ভাই, তাই অনেক ক্ষেত্রেই দোলন হয় ক্ষণস্থায়ী।"

দিলীপকুমার তাঁর অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির কথা জানিয়ে সত্যেন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। কিন্তু এই যোগবিভূতির আকর্ষণ সাধকের লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে বাধাস্বরূপ—এ-কথা শ্রীরামকৃষ্ণ একদা বিবেকানন্দকে বলেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতাবাদী যোগী নন, তবু তাঁর তত্ত্বান্বেষী মনে শ্রীরামকৃষ্ণের কথার প্রতিফলন দেখি। তাই তিনি এ প্রসঙ্গে দিলীপকুমারকে একটি চিঠি লিখছেন—"যে সব অপূর্ব অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছ, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা। তোমার পথের শেষ কোথায় জানি না, তবে মাঝ রাস্তার এই সব অনুভূতির রাজ্য ছাড়িয়ে হয়ত তোমাকে আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে। অপ্রত্যাশিত বিভূতির আকর্ষণে জড়িয়ে পড়লে হয়ত অনেকটা বাকী থেকে যাবে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে। উপনিষদের নির্দেশ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' হয়ত এর বেলাতেই প্রযোজ্য।"

ধর্মসাধকের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের মনোভাব বিশ্লেষণ করে দিলীপকুমার বলেছেন—"সত্যেন স্বভাবে ঠিক বিশ্বাসী না হলেও দুরন্ত সংশয়ীও নয়।" এরই আভাস পাই দিলীপকুমারকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে—"সৃষ্টির রহস্য আমরা কেউই ভেদ করতে পারি নি ভাই। তা ছাড়া সাধকের সাধনার ধন কিভাবে তার কাছে পৌঁছায় ক'জন মানুষই বা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে বলো ? তুমি হয়ত যে পথে এগিয়ে চলেছ সেখানে সব কিছুর

সত্যস্বরূপ এমনি আপনা-আপনিই চোখে ভেসে ওঠে কথার অপেক্ষা না রেখে।"

সত্যেন্দ্রনাথ স্বধর্মে বিজ্ঞানী, তাই বিজ্ঞানীর কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তিনি দিলীপকুমারের আধ্যাত্মিক সাধনাকে দেখেছেন ও তাঁর মনোভাব জানিয়েছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—"নিজেকে খুঁজে পেয়েছ, তাই শান্তিও তোমার করায়ত্ত হয়েছে। . এতদিনে যে তোমার সকল খোঁজ সফল হয়েছে তাইতেই আমার আনন্দ। বিজ্ঞানীর চোখে জগতটা চিরকালই বিস্ময়কর বস্তু হয়ে থাকবে—কৌতূহলকে চিরঞ্জীবী রাখাই তার পরম কাম্য। এ মনোভাবকে আশা করি তুমি নিছক পাষণ্ডীপনা ভাববে না।

তোমার আমার কিংবা বহুসহস্র সাধকের এমন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে যাদের প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবু বহু লক্ষ বহু কোটি জীবের মধ্য দিয়ে যে প্রকাশ চলেছে তার মধ্যেই সে যুক্তি ও ন্যায়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করছে"

সত্যেন্দ্রনাথ চিরদিন স্থিতধী, তাই ধর্ম সম্পর্কে কোনোদিনই তিনি বিশেষ আলোচনা করেন নি বা করতে চান নি। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান দাবি 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর'। কিন্তু যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীর পক্ষে এ দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীর মন সব কিছুর মধ্যে যুক্তি-প্রমাণের সন্ধান পেতে চায়। সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও এ দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলেই ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তিনি সাধারণত নীরব ও সংযতবাক্।

তবে 'তথাকথিত' ধর্মাচরণ সম্পর্কে একটি বিষয়ে তিনি তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। ধর্মের নামে ভড়ঙের বা আধ্যাত্মিকতা জাহিরিপনার তিনি ঘোরতর বিরোধী। এদেশে কথায় কথায় দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতার ধুয়া তুলে পাশ্চাত্ত্য বস্তুতান্ত্রিকতাকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে চেষ্টা করা হয় তা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তাই তিনি তীব্র ভাষায় বলেছেন—"এদেশে ধর্মধ্বজীরা যখন অনেক সময় নিজেদের দুর্দশার কথা বলে যান এবং চোখ দিয়ে অনবরত দুঃখের অশ্রু যখন তাঁদের পড়ে, তখন আমার মনে হয় যে ঘরের কোণে বসে কেবলমাত্র ভগবানের ওপর দোহাই না পেড়ে এবং মাথা না ঠুকে যদি প্রতীচ্যের লোকেরা বেরিয়ে পড়ে যে মানুষের

শত্রুকে আমরা দমন করব, সেটা কিছু একটা চিরন্তন সত্যের মধ্যে নিম্নস্তরের মনোভাব এই বলে নিজেদের বাহবা নেবার কোনো দরকার নেই।"

পারলৌকিক পরমার্থ লাভের চেষ্টায় ঐহিক জীবনের প্রতি ঔদাসীন্যের যে মনোভাব এদেশে যুগের পর যুগ চলে এসেছে তাতে জাতির সামগ্রিক কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হয়েছে বলে সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন— " it cannot be denied that a persistent propaganda that the world is a place of temporary stay of the individual who should think of his own salvation as the principal aim in life has its repercussion in creating a carelessness in all mundane matters." এই 'আত্মমুক্তি দার্শনিকতা'র ফল হয়েছে মারাত্মক এবং তার জন্যে বহু মূল্যও আমাদের দিতে হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বলছেন— "While this philosophy flourished in our country the neglect of a serious acceptance of life by our first-class thinkers brought second-rate petty people into prominence who gave lip-adoration to philosophy, but actually indulged in jealousy, squabble aud internal strife. As a result foreign invaders came, often by invitation, and established in India centuries of slavedom."

বহু শতাব্দীর শিক্ষা থেকে এ-কথা আজ উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে আত্ম-মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ না করে জীবনকে মানবোচিত দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সত্যেন্দ্রনাথ তাই বলেছেন— "The weal or the woes of the individual should not be made the principal object of philosophy, but the men in any country, closely knit by a common heritage, may be regarded as taking part in a relay race, where the advancement of the country......is more important than the fate of the individual runner."

এই বিকল্প জীবনদর্শনও মূলত ভারতীয়, যদিও "it may ultimately deny the individual soul as the ultimate reality and preach the sovereign rule of *Karma* (কর্ম)." এই কর্মযোগের কথা বুদ্ধদেব বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন। বুদ্ধদেব 'সেই মুক্তির কথা বলেছেন,

যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক ; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে ; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়'। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন—"তোমরা সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও ; যাও, অপরের সাহায্য কর। তোমরা সর্বদাই বড় বড় কথা বলিতেছ, কিন্তু এই তোমাদের কর্মপরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম।" আর এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের বলেই তিনি একদা বলেছিলেন—"May I be born again and again, and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls—and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship."

ধর্মপ্রবক্তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি নিজেই বলেছেন 'আমি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সবার থেকে বেশি ভক্তি করি বুদ্ধদেবকে'। আর স্বামী বিবেকানন্দ যে আত্মমুক্তির চেয়ে মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘবের কাজে আত্মনিয়োগের জন্যে বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার মধ্যে নিজের জীবনদর্শনের মন্ত্র খুঁজে পান বলেই সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—'May we all remember his (Swamiji's) message, and gird up our loins to raise the wheel of the car of humanity from the mire in which it has got stuck and sunk !"

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আর সে-কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন 'জীবনদেবতার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তার চর্চা ও অনুশীলন নিভৃতে হওয়া দরকার। তার ভেতর থেকেই মানুষ হয়ত পাবে তার প্রতিদিন কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা'। জীবনদেবতা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করলেও তিনি এ-কথা বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে 'a harmonisation of worldly duties with the other-worldliness may be brought about.'

আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা নিয়ে মানুষের মতদ্বৈধ দীর্ঘকালের—

অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন —"পৃথিবীতে মানুষ যতদিন আছে তার মনে এই দ্বৈতভাব থাকবেই। কিন্তু বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশ ওপবের দিকে চলেছে, তাব সভ্যতা ক্রমশ উর্ধ্ব পথে চলেছে—এটা বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে। কাজেই সে ভাবে নিছক কল্পনাব উপর নির্ভব কবলে মানুষেব জয়রথ এগোবে না। প্রকৃতিব শক্তিভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ-কবা জ্ঞানের উপব প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে মানব সভ্যতাকে।"

সত্যেন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য বস্তুতান্ত্রিকতার সামঞ্জস্য দেখে কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পাবেন সত্যেন্দ্রনাথ বুঝি তাঁব স্বদেশকে যথার্থ ভালবাসেন না। এব উত্তবে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমি যে আমাব নিজেব দেশকে ভালবাসি না তা নয়। তবে আমি এই বলি যে ভালবাসা যদি এমন রূপ নেয় যাতে পদে পদে সত্যেব অপলাপ কবতে হয়. তা হলে সে-ভালবাসাব কোন দাম নেই। যাকে গ্রহণ কবতে হবে, যাব প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তাব যদি সমস্ত দোষ পর্যন্ত আমি গুণ বলে বর্ণনা কবি তা হলে সে কাব্যেব জগতেই চলে। মানুষেব মধ্যে সেই মনোভাব আনা অত্যন্ত দুষ্কব।"

যাঁরা আধ্যাত্মিকতাবাদী তাঁবা বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপন করে থাকেন—আজকাল এদেশে ও অন্যত্র বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার উপর যে অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তাব ফল হযতো শেষ অবধি মানব-সমাজের পক্ষে মঙ্গলময় হবে না। বিজ্ঞান হযতো শেষ অবধি আমাদেব ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে—শ্রেয়ের আসনে প্রেয়কে বসাচ্ছে। পর পর দুটি বিশ্ব-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষ দেখেছে বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি ডেকে এনেছে। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—"দুঃখের কথা এই যে, যাঁরা দেশে দেশে রাষ্ট্রের হাল ধরেছেন তাঁরা বিজ্ঞানী নন। অনেক সময় তাঁরা ধার্মিক, অনেক সময় তাঁরা জাতীয়তাবাদী। অনেক সময় তাঁরা বিশ্বাস করেন, একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে তাঁর স্বজাতির সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবীতে এবং তাঁর বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে জমি দুরমুস করে অন্য সকলের উপর এই এক সভ্যতার গাড়ি চালিয়ে দেওয়া। সম্প্রতি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেল তার

জন্যে দায়ী যাঁকে বলা হয় সেই ডিক্টেটর হিটলার সত্যকারের খুব ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখব, তিনি আমিষ কখনও ছুঁতেন না ইত্যাদি অনেক কিছু। যে সব বাহিরের অঙ্গ থেকে আমরা বিচার করি, তা থেকে আমাদের মনে হবে ধার্মিক লোকের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় তা সত্য করেই মানুষের পক্ষে ভালো। জার্মান জাতি বিপদের কবলে একেবারে যখন রসাতলেব অধঃস্থলে যেতে বসেছিল, তখন হিটলার এগিযে এসেছিলেন দেশের 'ত্রাতা' হিসাবে। বলেছিলেন, 'যদি এ যুদ্ধে আমরা হাবি, তা হলে জার্মান জাতি হাজাব বছরের মধ্যে আর উঠতে পারবে না।' তারপর কত কি ঘটে গেল জার্মানীব ভাগ্যে। আজ শুধু এইটুকু বলতে ইচ্ছে করে, আজকের দিনে সেই অত্যন্ত নিম্ন রসাতল পতিত জাতি যদি আবার উঠে থাকে তা হলে সেটা বিজ্ঞানের জোরেই। বিজ্ঞানীরাই আবার তাকে টেনে তুলেছে। জার্মান জাতির মধ্যে যা কিছু দেবার ছিল সে শুধু দর্শনশাস্ত্র নয়, সেই সঙ্গে ছিল জীবনের সর্বক্ষণ কাজে লাগিয়ে জ্ঞান সংগ্রহের অদম্য প্রয়াস। তাই মহাযুদ্ধের মধ্যে তার সর্বস্ব বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও মানুষেব সেবায় সেই জ্ঞানের সাহায্যে জার্মান জাতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বিনষ্ট সমৃদ্ধি পুনরায় গড়ে তুলেছে।"

বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের মধ্যে হিংসা দ্বেষ হানাহানি বেড়ে গেছে—এ অনুযোগও আধ্যাত্মিকভাবাদীরা করে থাকেন এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলেন যে আধ্যাত্মিকতার পথে মানুষ চালিত হলে এ সমস্ত দূরীভূত হবে। এ-সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—"শুধু দর্শনশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যদি আমরা ভাবি যে আমরা মানুষ সকলে এক ও এইভাবে হিংসাদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে আমরা সারা জীবন কাটাতে পারব তা হলে এতদিন পর্যন্ত সে-কথা কেবল বৃথা মনোভাবেই পর্যবসিত হয়েছে—হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা তা বুঝতে পারব। এইভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যা যেখানে যে দেশে পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল বলে আমরা মনে করি—সেখানেও কোনকালে হিংসা দ্বেষ সংঘাতের বিরাম হয় নি। আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন যে শুধু দার্শনিক দিয়ে যদি এই পৃথিবী ভরে থাকত (এরকম নাকি একসময়ে ভারতে ছিল) তা হলেও বোধ হয় পৃথিবী থেকে হিংসাদ্বেষ লোপ পেত না। বিজ্ঞান-

চর্চা থাকত না, কাজেই আণবিক বোমার আবিষ্কার হত না। তবুও নিপাত করার ও উৎসন্ন দেবার যে-সব সাধারণ অস্ত্র ছিল সেই সব অস্ত্রের ব্যবহার চলত এবং সেগুলি ঠিক সেবকমই নির্মম ও সর্বনেশে। মানুষকে মানুষ ভেবে মানুষ যে বিশেষ সম্মান করে এসেছে এতকাল তা আমার মনে হয় না। তবু আজকের দিনে বিংশ শতাব্দীতে মানুষ সেইভাবে সাধনার পথে সবে এগোতে শুরু করেছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানচর্চার ফলেই। কেননা জাতি-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানুষ সমাজ এক—একথা কেবল বিজ্ঞানীরাই বলেছেন।"

তিনি আরও বলেছেন—"মানুষ জাতির মনোভাব আজকের দিনে কোন পথে চলেছে কে বলবে? তবে এইটুকু আশার কথা, যে-সব ছোট ছোট দেশ জাতীয়তাবাদের মধ্যেই মনটা ডুবিয়ে রাখত, আজকের দিনে তারা সারা মানুষের জন্যে ভাবতে শিখেছে। কাজেই নানা সময়ে বার বার সকলে মিলে এইটেই আলোচনা করছে—ভবিষ্যতে মানবসমাজে আমাদের কি কর্তব্য? মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, একে আরও উন্নত করতে হলে আমাদের মনোভাব কিভাবে বদলাতে হবে? বহু দেশবাসী যে একত্র হয়ে আজ ভাবতে চাচ্ছে—এক হিসাবে বিজ্ঞান না থাকলে এটা কখনও সম্ভব হত না।"

কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সভ্যতার সৌধ যদিও পৃথিবীর সর্বত্র গড়ে উঠেছে, তবু সব মানুষের মনে আজও শুভবুদ্ধি জাগে নি। আজও প্রতিযোগিতা চলেছে অমোঘ মারণাস্ত্র সৃষ্টি করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোন জাতি জগতে একেশ্বর হয়ে বিরাজ করবে। তাই প্রশ্ন জাগে—বিজ্ঞানসেবা কি শেষ অবধি হিংসার ইন্ধন জুগিয়ে পরিণামে মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করবে? সব দেশের বিজ্ঞানপ্রেমিকদের আজ এই প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথও দিয়েছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বিজ্ঞানপ্রেমিক নন, তিনি মানব-প্রেমিকও। তাই মানবতার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তিনি বলেছেন—"মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে—সে যদি অনুসরণ করে ব্যক্তিনির্বিশেষে দয়া ও সহযোগিতার মনোভাব, তা হলে যে সংঘাত ও দ্বেষের প্রকোপ আজ দেখা যাচ্ছে, তার নিরসন হবে। তা হলেই সার্বজনীন বিশ্বমানবের আবির্ভাব হবে। অন্যথায় যেমন অতিকায় জীবজন্তুরা অতীতেই লোপ পেয়েছে ও সাক্ষ্য দিতে আছে মাত্র তাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের অবশেষ, ভবিষ্যতে মানবসভ্যতারও ঐরূপ

বিষাদভরা পরিণাম হওয়া বিচিত্র নয়।...ভবিষ্যতের সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে জাতিধর্মনির্বিশেষে, তার মধ্যে থাকবে সব মানুষের স্থান। বিজ্ঞানোচিত মনোভাব, হিংসাদ্বেষের পরিবর্তে সহযোগিতা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা দরকার। বিজ্ঞানের পথেই জয়লাভ হবে।"

সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের ভাষণ ও বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে তাঁর জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র 'সবার উপর মানুষ সত্য'। একটি ভাষণে এই গভীর প্রত্যয় প্রকাশ করে তিনি বলেছেন— "Man is the ultimate and the supreme truth which we should realise and I would hope that ··this supreme realistic view preached by the ancient poet of the land should be accepted as a symbol and as an ideal."

এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই তিনি মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ সর্বদা কামনা করেছেন এবং যে সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতি মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে, যা কিছু মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী তার প্রতি তিনি কোনোদিন সমর্থন জানাতে পারেন নি। বিশ্বকবির অন্তরাকাঙ্ক্ষার অনুরণন তুলে তিনিও তাই একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছেন এমন মানুষ ও মানবসমাজ—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করে নি শতধা ;..."

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

বিজ্ঞানী, বিদগ্ধ ও মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের পরেও তাঁর আর একটি বড়ো পরিচয় থেকে যায়। সে-পরিচয় এদেশের বিজ্ঞানী ও মনীষীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথকে এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা দান করেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে তাঁর দীর্ঘকাল যাবৎ ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যেই সে-পরিচয় পরিস্ফুট। এ-বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য ও প্রচেষ্টার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার আগে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন এই পথের পূর্বসূরীদের প্রয়াসের কথা, কারণ তাঁদের উত্তরসাধকরূপেই তিনি এই প্রচেষ্টায় ব্রতী।

এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় মিশনারীরাই এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার গোড়াপত্তন করেন। ১৮১৪ সালে উইলিয়ম কেরী এবং হ্যারিংটন দুজনে পৃথকভাবে এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম উল্লেখ করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সুপরিকল্পিতভাবে আরম্ভ হয় হিন্দু কলেজে। ১৮১৭ সালে প্রধানত ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজে বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হবার পর থেকে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানালোচনারও সূচনা হয়। প্রধানত তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান তিনটি হচ্ছে শ্রীরামপুর মিশন, হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি। শ্রীরামপুর মিশন ১৮১৮ সালে প্রকাশিত তাঁদের 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। এ-ছাড়া, বাংলা-ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা ও ছাপার কাজে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা নানাভাবে সাহায্য করেন। এই প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়ম ইয়েটস, ফার্গুসন, ফেলিক্‌স্ কেরী, পিয়ার্সন, জন ম্যাকে প্রমুখদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্যে এদেশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সমর্থন জানিয়ে

পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা শুরু করার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি ভারতের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের কাছে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"But as the improvement of the native population is the object of the Govt, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instructions embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished······by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing a college, furnished with the necessary books, instruments and other apparatus." রামমোহনের এই চিঠিখানি এদেশে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে একটি অতি মূল্যবান দলিল।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ (পরবর্তীকালে এই কলেজ পরিণত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে) স্থাপিত হবার অল্পকালেব মধ্যে এই শিক্ষায়তনে বিজ্ঞানচর্চা নিয়মিতভাবে শুরু হয়। অবশ্য ইংবেজি ভাষাব মাধ্যমেই এখানে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু ভাষাব মাধ্যম বিদেশী হলেও এদেশের জনসাধারণ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং তারই ফলে পরবর্তীকালে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় এবং শিক্ষিত জনগণের মধ্যে এবিষয়ে স্পৃহা বাড়তে থাকে।

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীব গোডার দিকে ব্রিটিশরা যখন এদেশে বসবাস শুরু করে, তখন তাদের রোগ চিকিৎসাব জন্যে ইউরোপ থেকে ইউরোপীয় ডাক্তারদের আনা হত। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ডাক্তারের অধীনে কিছু সংখ্যক এদেশীয় লোককে রোগঅসুখ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। এদের বলা হত নেটিভ ডক্টর (native doctor) এবং সামরিক ও বেসামরিক হাসপাতালে কাজ করবার জন্যে সরকার এদের অনুমতি দান করতেন। এই নেটিভ ডাক্তারদের সুসংবদ্ধভাবে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্যে ১৮২৪ সালে কলকাতায় সর্বপ্রথম একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। 'নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট' নামে এটি পরিচিত ছিল এবং এদেশীয় ভাষাতেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হত।

১৮২৬ সালে সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে চরক ও সুশ্রুত এবং শেষোক্তটিতে ইউনানি পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হত। এই সময় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রাচ্যদেশীয় পদ্ধতি অনুসরণকারীদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। তাব ফলে সপারিষদ গভর্নর-জেনারেল এবিষয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটিব সুপারিশ গ্রহণ কবে ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিক নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট তুলে দিয়ে ইংরেজি ভাষাব মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সংকল্প ঘোষণা করেন। এর ফলে ১৮৩৫ সালে কলকাতায় প্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয। যদিও মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরেজি, কিন্তু ১৮৫২ সাল থেকে এখানে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। পববর্তীকালে আবাব বাংলার স্থান অধিকাব করে ইংরেজি।

বাংলাভাষার বিজ্ঞান গ্রন্থ বচনাব পথ দেখিয়েছিলেন ইউরোপীয় মিশনারীরা। তাঁদের ভাষায় কৃত্রিমতা ও জটিলতা ছিল সত্য, কিন্তু তাঁরাই যে সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ বচনা করে বিজ্ঞানেব প্রতি এদেশীয়দের অনুরাগ সৃষ্টির চেষ্টা কবেছিলেন সে-কথাও সত্য। এদেশীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন। তিনি বাংলায় একটি ভূগোলের বই লিখেছিলেন।

কিন্তু বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে। কৃত্রিম ভাষার আড়ষ্টতা দূর করে তিনি সরল ও সরস বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখে বিজ্ঞানসাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি একদিকে যেমন 'চারুপাঠ', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'পদার্থবিদ্যা' প্রভৃতি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেন, অপরদিকে 'বিদ্যাদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখতেন।

অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক যুগে আরও কয়েকজন মনীষী জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই উপলব্ধি

করেছিলেন দেশ ও জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য এবং সর্বজনবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করতে না পারলে দেশবাসীকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সকলে মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছিলেন। •

ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ৫০ বছরের পাঠক্রমে ইংরেজি শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। হাইস্কুল ও কলেজে কলা ও বিজ্ঞানের সকল বিষয় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। এই পদ্ধতিই এদেশে শিক্ষা বিস্তারের সর্বোত্তম পন্থা বলে তখন বিবেচিত হত। দেশের বিদেশী শাসকবর্গ তাঁদের প্রশাসনের কাজ চালাবার জন্যে ইংরেজিশিক্ষিত এদেশীয়দেব নিয়োগ করতেন এবং এদেশের অভিভাবকেরা দেখতেন নিরুদ্বেগ আরামদায়ক সরকারী চাকরিতে তাঁদের সন্তানদের বসাতে হলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর ফলে বুদ্ধিজীবীদের কলম-পেশাব চাকরি লাভের পথ প্রশস্ত হলো বটে, কিন্তু দেশের বিরাট জনসাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো এবং তার ফলে দেশে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রসার হতে পারে নি। আমাদের দেশের বিগত এক শত বৎসরের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে।

১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬০ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল—"প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসর কালের মধ্যে দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন গবর্ণমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রে কর্তব্য।"

১৯ জানুয়ারী ১৮৬৩ তারিখের 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদবিবরণে দেখি—"১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টা সময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুল নামক বিদ্যালয়ে সর্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিত হইল। প্রথমতঃ ঐ সভায় সভ্যগণের উপবেশনান্তর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বসু এই প্রস্তাব করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ইহাতে

আমাদিগের এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা .স্থাপনাকাঙ্ক্ষিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁহাদিগকে সরলতা কহা উচিত কার্য।”

•

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান প্রসারের পথ প্রশস্ত হলো সন্দেহ নেই, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় বিজ্ঞান এদেশের জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। দেশব্যাপী অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে তিনি এদেশবাসীদের বিজ্ঞানচর্চার জন্যে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা মনেপ্রাণে অনুভব করেন। তিনি নিজে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে পত্র-পত্রিকায় আবেদন জানালেন—“পূর্বকালে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার যথেষ্ট সমাদর ছিল—প্রাচীন হিন্দুরা গণিত, আয়ুর্বেদ, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিজ্ঞানের বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তবে দুঃখের বিষয় এখন অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে—তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপনা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।”

মহেন্দ্রলালের এই পরিকল্পনায় পোষকতা করতে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং এই উদ্দেশ্যে প্রভূত অর্থও সংগৃহীত হলো। অবশেষে ১৮৭৬ সালের ১৬ জানুয়ারি মহেন্দ্রলালের স্বপ্ন রূপায়িত হলো বাস্তবে—বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর সভাপতিত্বে এবং দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (Indian Association for the Cultivation of Sciences) স্থাপিত হলো। ২১০ বহুবাজার স্ট্রীটে এই বিজ্ঞানসভার ভবন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের বিজ্ঞান সাধনা শুরু করেন নি। এই বিজ্ঞানসভায় মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা ছিল না, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকে ও মৌলিক গবেষণার দিকেই এখানে নজর দেওয়া হত। তবে এই বহুবাজারের গবেষণাগারে গবেষণা করেই অধ্যাপক সি ভি রামন

১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ভারতীয়েরাও যে মৌলিক গবেষণায় নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারেন তা অধ্যাপক রামনের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সেদিন বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহল উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে যাদবপুরে এই বিজ্ঞান-সভার বিরাট সৌধ নির্মিত হয় এবং বহু বিজ্ঞানী নিজ নিজ বিষয়ে সেখানে গবেষণা করার সুযোগ লাভ করেন।

এইভাবে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান-সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদেশে বিজ্ঞানচর্চা প্রসার লাভ করতে লাগলো, অপরদিকে বাংলার সাহিত্যাচার্যেরা জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে এগিয়ে এলেন।

বাংলার যুগ-প্রবর্তক সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্র যিনি 'সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন'—লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (কার্তিক ১২৮৯) 'বঙ্গে বিজ্ঞান' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন? সমাজে তাহাদের বৈজ্ঞানিক শক্তিই বা কতটুকু হইবে? ...তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতেই হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দেশবাসীকে দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে, বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাতেও বাংলা-

ভাষায় বিজ্ঞানের নানাকথা প্রচারিত হতে থাকে এবং নানা লেখক এই কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেন।

এরপর বাংলাভাষায় দেশের সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনের ব্রত নিয়ে এগিয়ে এলেন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের নব-পথিকৃৎ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর নিজে ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে ও বিজ্ঞানচর্চা না করলে এদেশের মানুষকে প্রকৃত বিজ্ঞানমুখী করে তোলা অসম্ভব এবং দেশের প্রগতিও ত্বরান্বিত হবে না। রামেন্দ্রসুন্দর যখন অধ্যাপনায় ব্রতী, তখন ইংরেজির মাধ্যমেই স্কুলকলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয় বলে তাঁদের একটা অমূলক ধারণা ছিল। স্কুলকলেজে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করা অপরাধস্বরূপ বলেই তখন বিবেচিত হত! সেই যুগে রামেন্দ্রসুন্দর কলেজে অধ্যাপনাকালে বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি, বরং তাঁর ব্রত বলেই গ্রহণ করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন—"আমাদের বাঙলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।...এমন এক সময় ছিল, যখন স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ আপনাদের মধ্যে এবং ছাত্রগণের সহিত কথোপকথনে বাঙলার ব্যবহার বেয়াদপি বলিয়া গণ্য করিতেন।...ক্লাশে বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙলার ব্যবহার বোধ হয় এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং অধ্যাপনা ব্যবসায়ী। বিজ্ঞান বিদ্যার সহিত আমার আর কিছু সম্পর্ক না থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারণ অনুসারে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনাই আমার জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেইজন্য অন্তত জীবিকার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞান আলোচনাও করিতে হইয়াছে। অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙলা ভাষায় অধ্যাপনা যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-সঙ্ঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না।"

বাংলাভাষাকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান আলোচনার উপযুক্ত বাহন করবার জন্যে

বিজ্ঞানসেবক রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণপাত করেছিলেন। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজে যেমন লেখনী ধারণ করেছিলেন, তেমনি সমধর্মী বিজ্ঞানসেবীদের কাছেও তিনি একান্ত আবেদন জানিয়েছিলেন—"বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণত যে ভাষায় আপনাদের মধ্যে কথা কহিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই বোঝেন জনসাধারণের তাহা বোধ্য নহে। তাঁহাদের কর্মপ্রণালী কতকটা অদ্ভুত গোছের। তাঁহারা যে পথে, যে প্রণালীতে, যে মন্ত্রের সাধন করিতেছেন, তাহা অধিকারী ভিন্ন অন্যের পক্ষে সুগম নহে। তাঁহাদের সাধনাক্ষেত্রে দীক্ষিত ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ। সাধনা মন্দিরের বহির্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবত সংকোচ বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে উর্ধ্বমুখে ও শুষ্ক হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী এবং ফলভোগে অধিকারী।... যাহা কিছু তাঁহারা (বৈজ্ঞানিকরা) আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্বাচন করিলে চলিবে না। নিতান্ত অনধিকারীর নিকট বিতরণ করিতে গিয়া বিদ্যার মাহাত্ম্যকেও খর্ব করিবার আশঙ্কা থাকে। ভূমি যেখানে নিতান্ত অনুর্বর সেখানে বীজ ছিটান কেবল পরিশ্রমের অপব্যয়। এ সমস্ত যুক্তি স্বীকার করিলেও দেখিতে পাই সত্যের অন্বেষণে যাঁহারা উজ্জ্বল বর্তিকা হস্তে করিয়া পুরোগামী হইয়াছেন তাঁহারাই আবার আপনাদের মেরুদণ্ড ক্ষণেকের জন্যও আনত করিয়া, নিম্নতর সোপানে নামিয়া আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারে আনন্দলাভ করিতেছেন।...বাঙলা দেশে যে-সকল মনস্বী পণ্ডিত এবং তাঁহাদের উৎসাহী ছাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন তত্ত্ব আহরণে নিযুক্ত হইয়াছেন...তাঁহারা একত্র উপস্থিত হইয়া পরস্পর ভাব বিনিময় করুন, ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণকেও একেবারে বিস্মৃত হইবেন না।... সাধারণের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের নিজের ভাষা ছাড়িয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে হইবে।"

ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে সর্বক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার প্রবল বন্যা দেখা দিল। তার ফলে যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলো। দেশেব মনীষী ও জননায়কেরা তখন কামনা করেছিলেন জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষা প্রচলিত হোক। এবং সেইভাবেই জাতীয় বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয়েছিল। সেখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হত।

এদেশের বিজ্ঞানীদের কাছে বামেন্দ্রসুন্দব যে একান্ত প্রত্যাশা জানিয়েছিলেন 'সাধাবণের সামনে এসে সাধারণের বোধ্য ভাষায় তাঁবা বিজ্ঞানেব কথা প্রচার করুন,' সে-প্রত্যাশা পুর্ণ করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ বিজ্ঞানসাধকেরা। আচার্য জগদীশচন্দ্রই এদেশের প্রথম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছিলেন এবং তাব প্রমাণ-স্বরূপ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন। এছাড়া তাঁর রচিত নানা নিবন্ধে এবং সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদিতে প্রদত্ত তাঁর নানা ভাষণে তিনি সাধারণের বোধ্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) সেগুলি তাঁর অনুপম বিজ্ঞানগ্রন্থ 'অব্যক্ত'-তে সংকলিত হয়েছিল।

নিজে বিজ্ঞানী হয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব কতখানি—"যতদিন একদিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে কোটি কোটি নরনারী অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে, ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা কম। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিখিতেছেন, তাঁহারা অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশিরবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।"

এই উপলব্ধিতেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। তার বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ আলোচনার অধিকাংশই বাংলাভাষায় লিখিত। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান তথা অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ বহু উপলক্ষে তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। "মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ না করিলে স্বদেশের মঙ্গল সাধিত হয় না"—এই ছিল তাঁর সুনির্দিষ্ট ধারণা। চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য

সম্মিলনে (১৯১২) প্রদত্ত 'বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানাচর্চা' ভাষণে তিনি এই কথাই আরও জোরের সঙ্গে বলেছিলেন—"বিজ্ঞানের শিক্ষা স্বয়ং প্রকৃতির নিকট হইতেই শিক্ষালাভ। উহা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। একটা বিদেশী ভাষার কবলে উহাকে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে।······তোমরা ইংরাজীতে বিজ্ঞানালোচনা করিবে ; প্রথমে ভাব দেখি,·তোমার দেশবাসীর মধ্যে কয়জন ইংরাজী বুঝিবে। অথচ সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি না জানা থাকায় লোকে কত কষ্ট ভোগ করিতেছে। ম্যালেরিয়া ও মশকে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পতঙ্গ কি-প্রকারে শস্য ধ্বংস করে, রেশম কীটের কোন্ কোন্ ব্যাধি হয় এবং কিরূপে তাহা নিবারণ করা যায়, সারের প্রকারভেদের সহিত চাষের কি সম্বন্ধ এবং সামাজিক রীতিনীতির উপব সামাজিক উন্নতি কতখানি নির্ভর করে এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যদি দেশের লোকের নিকট সুপ্রাপ্য হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হয়! ....যদি ঘাটে পাটে বাটে মাঠে এই সকল বিষয়েব আলোচনা দেখিতে চাও, তাহা হইলে মাতৃভাষার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রের পথে পরবর্তীকালে অনুবর্তী হয়েছিলেন জগদানন্দ রায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানসেবীরা।

এই প্রসঙ্গে আর একজন মহামনীষীর কথা স্বভাবতই মনে পড়ে—'বিজ্ঞানের সাধক' না হয়েও 'বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে' যাঁর 'লোভের অন্ত ছিল না', বিদেশে 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' (বঙ্গদর্শন', আষাঢ় ১৩০৮) যিনি প্রথম এদেশে ঘোষণা করেন, পঞ্চসপ্ততি বৎসর বয়সেও যিনি 'বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে' তাঁর স্বর্ণপ্রসূ লেখনী ধারণ করেছিলেন। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলনীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' রচনা করেছিলেন (১৩৪৪) এবং এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে।

এই গ্রন্থ-রচনার একটি মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত শুনেছি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে—"সবাই যেমন যায়, আমিও তেমনি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছি

একবার। তখন সেখানে আমাব ছাত্র প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বিজ্ঞানেব অধ্যাপক। আমি যখন ববীন্দ্রনাথের কাছে যাই, তখন প্রমথ সঙ্গে ছিলেন। প্রমথকে বিজ্ঞানের একখানা বই লেখাব ভাব দিযেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটি ববীন্দ্রনাথ দেখেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই লেখা সম্পূর্ণ কবেন। তিনি এই বই-এব নাম দেন 'বিশ্বপবিচয'। আমাকে বইটি দেখে দিতে বলেছিলেন। আমি রাজী হই নি। তিনি লিখেছেন তা-ই আমাদের ভাগ্য। তাঁর লেখা আমি কি দেখব। পবে দেখলুম, 'প্রীতিভাজনেষু' সম্বোধন কবে 'বিশ্বপবিচয' তিনি আমার নামেব সঙ্গে যুক্ত করেছেন।"

ববীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও বিজ্ঞানেব প্রতি তাঁব অনুবাগ ও কৌতূহল ছিল অবাল্যকাল। তিনি জানতেন, যদিও 'গল্প এবং কবিতা বাংলাভাষাকে অবলম্বন কবে চাবিদিকে ছড়িযে পড়েছে,' কিন্তু 'তাতে অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তিব দুবলতা এবং চবিত্রের শৈথিল্য ঘটবাব আশঙ্কা প্রবল হযে উঠেছে'। তিনি অনুভব কবেছিলেন, 'এব প্রতিকাবেব জন্য সর্বাঙ্গীন শিক্ষা অচিবাং অত্যাবশ্যক। এবং 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক কববাব জন্য প্রধান প্রযোজন বিজ্ঞান চর্চাব'। 'বিশ্বপরিচয'-এব ভূমিকায তিনি লিখেছিলেন —"প্রকাশলোকেব অন্তবে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ কবে বিশ্বব্যাপাবের মূল বহস্য কেবলই অবাবিত কবছে। যে সাধনায এটা সম্ভব হযেছে তাব সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেবই নেই। অথচ যাবা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবাবেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগেব প্রত্যন্তদেশে একঘবে হযে রইল। বড়ো অবণ্যে গাছতলায শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে কবে উর্বরা। বিজ্ঞান-চর্চাব দেশে জ্ঞানেব টুকবো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদেব মন আছে অবৈজ্ঞানিক হযে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদেব অকৃতার্থ করে রাখছে।"

দেশবাসীব এই মানসিক দৈন্য ও কর্মের অকৃতার্থতা দূরীকরণের জন্যে রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রবর্তন করেন। কিন্তু শুধুমাত্র জনসাধারণের মধ্যে লোকশিক্ষা প্রসারের জন্যে মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত থাকতে চান নি,- তিনি চেয়েছিলেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব কিছু মাতৃভাষার মাধ্যমে হোক। এ-বিষয়ে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন—"খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলাভাষার দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চ শিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে 'গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।"

এই মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজও ভরসা করে বলতে পারলেন না যে বাংলাভাষাতেই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হবে। তাঁদের মনের মধ্যে একটা সংশয় বা ভীরুতা রয়ে গেছে, এ বুঝি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন—"আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিযা এটুকু কোনো দিন বলিতে পারিব না যে উচ্চ শিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকারপ্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণী-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

কারো কারো মতে সাহিত্য ও মানব-সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ের উচ্চশিক্ষা যদিও বা বাংলা ভাষায় সম্ভব, কিন্তু উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা বাংলা ভাষাতে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই।"

এরপর তর্ক উঠবে, "তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"নাই সে-কথা জানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ

বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতাব জোগাড আগে হওয়া চাই তারপরে গাছের পালা এবং কুলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পডিতে হইবে। বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহিব হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"

রবীন্দ্রনাথ তাই জীবনসায়াহ্নে তাঁর 'তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়েব কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন' জানিয়েছিলেন: "তোমার অভ্রভেদী শিখরচুডা বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূব হোক, যুগশিক্ষাব উদ্‌বেল ধারা বাঙালি চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কুল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।"

রবীন্দ্রনাথের এই অন্তরাকাঙ্ক্ষা আজও পরিপূর্ণ হয় নি। স্যাব আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় সে-মর্যাদা আরও বর্ধিত হয়। বর্তমানে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে এবং ডিগ্রী পরীক্ষায় কলা বিষয়ে পাস কোর্সে মাতৃভাষায় প্রশ্নোত্তর লেখা চলে বটে; কিন্তু অনার্স ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় মাতৃভাষা আজও অপাঙ্‌ক্তেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের পথে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সর্বস্তরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা দানের দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং এই দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘকাল যাবৎ নিরলস প্রয়াস করে আসছেন।

জীবনের প্রারম্ভে সত্যেন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী যুগের পরিবেশে লালিত বর্ধিত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের সান্নিধ্যে এসেছেন, তখন থেকে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং মাতৃভাষার বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তাঁর সে বিশ্বাসভূমি

দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে এবং আজ জীবনসায়াহ্নে তিনি স্থিরনিশ্চিত হয়েছেন যে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে সর্বস্তরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সত্যেন্দ্রনাথ নিজে বহুদিন পূর্ব থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলাভাষায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সেই সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্যেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে প্রধানত তাঁরই উৎসাহে ও প্রেরণায় দ্বৈমাসিক বাংলা বিজ্ঞান-পত্রিকা 'বিজ্ঞান-পরিচয়' প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ সালেব জানুয়ারী মাসে এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছিলেন—"প্রকৃতির সঙ্গে সত্য পরিচয় না থাকলে জীবনযাত্রায় মূঢ়তার দ্বার অবারিত থাকে, সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস অবাধে সমাজেব ভাবনাকল্পনা ও ক্রিয়াকলাপকে অধিকার করে বসে, প্রকৃতির সঙ্গে তার সত্য ব্যবহার ভ্রষ্ট হয়ে মানুষকে পদে পদে অকৃতার্থ করে দেয়। আমাদের দেশে এই দুর্গতির দৃষ্টান্ত চারদিকে পরিব্যাপ্ত, আমাদের অধিকাংশ পরাভবের মূল এই অজ্ঞানের মধ্যে, অথচ মোহাবিষ্ট মন তার যথার্থ কারণ বুঝতে পারে না। এইজন্য আমি মনে করি দেশকে বিজ্ঞান শিক্ষায় অভিষিক্ত করে দেওয়া তার সফলতা সাধনেব উদ্দেশে একটি মহৎ কর্তব্য।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও উক্ত সংখ্যায় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন—"...ব্যাপক-ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাব প্রসার না হইলে আমরা বর্তমান জগতের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিব না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

পরাধীন দেশে প্রতিকুল আবহাওয়ার মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষার এই ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয় নি। তাই দেশ যেদিন স্বাধীন হলো সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ পরম উল্লসিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এবার দেশের সর্বত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তিত হবে এবং দেশের সর্বসাধারণের ঘরে ঘরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দেওয়া যাবে। বহুদিন থেকে তিনি উপলব্ধি করছিলেন—কেবলমাত্র শিক্ষায়তন ও গবেষণাগারের গণ্ডীতে বিজ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ থাকলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাদের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে। দেশ স্বাধীন

হবার পর নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। পরিষদের পরিচালনায় প্রকাশিত হলো বাংলা বিজ্ঞান মাসিকপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মধ্য দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্নসাধ রূপায়ণের পথ খুঁজে পেয়েছেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি এর সভাপতি এবং এরপর নানা সভা সম্মেলনে তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অনেকেই তাঁকে এই বিষয়ে ভুল বোঝেন। তিনি নিজেই বলেছেন—"আমার অনেক নিকট বন্ধুরাও এই বিষয়ে আমাকে ভাল বোঝেন না মনে করেন এটা আমার একটা খেয়ালমাত্র।"

১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সত্যেন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। আজীবন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতালব্ধ দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে তিনি সেদিন বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন—" And now more than ever has arisen the need of adopting the language of the province as the medium of instruction in all classes within the University This foreign language (English) has been a real hindrance to rapid spread of literacy in the country. In an educational institution, it encourages cram and effectively damps all creative efforts."

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য শ্রীসুবজিত লাহিড়ী সমাবর্তন অনুষ্ঠানেই সত্যেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং পরে পত্রপত্রিকায় তাঁর অভিমতের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

যাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তাঁদের একটা প্রধান বক্তব্য ইংরেজি ভাষার দরুনই এদেশে জাতীয় সংহতি এতদিন বজায় ছিল এবং ইংরেজি ভাষা না থাকলে জাতীয় সংহতিও বিনষ্ট হবে। এর উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—"বলা হয় আমরা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল দিয়ে একত্র বাঁধা ছিলাম তখনই আমাদের মনে ছিল যে আমরা একই জাতি। অতএব বর্তমানে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই সেই যোগসূত্র বজায় রাখা হোক। কিন্তু

একথা বললে ভুল হবে যে ঐ শৃঙ্খল পরবার আগে আমাদের জাতীয়তাবোধ ছিল না। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানে আছেন, দেশের ঐক্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে ততটা অনুভব করেন না। আমাদের নেতারা সব সময়ে অবহিত নন যে সত্যি পরস্পরের মধ্যে ঐক্যসূত্র কত নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে। দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যখন বিদেশে গিয়ে একত্র হন তখন তাঁদের চোখে ঠেকে তাঁদের মনের গঠন এবং আচারব্যবহার বিদেশীদের থেকে কত তফাৎ সেইজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে প্রাদেশিক ভাষায় নিজ নিজ প্রদেশে যদি শিক্ষা শতকরা পুরোপুরি চালানো যায় তা হলে দেশের ঐক্য ভেঙে যাবে না।"

আবার কেউ কেউ বলেন, ইংরেজি চর্চা কমিয়ে দিলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হবে এবং আমরা সার্বজনীন জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হব। এ-প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে—"যাঁরা বলেন যে ইংরেজি যদি কম শেখানো হয় তা হলে আমাদের দেশের জানালা বন্ধ করে দেওয়া হবে—যার মধ্য দিয়ে আসে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতার বাতাস—তাঁরা মনে করছেন যে চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাঁচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে, যেটা কেবলমাত্র উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবেন সেইরকম নিচের অজ্ঞ লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্টদায়ক। তা ছাড়া, নিজেদের সকলের দায়িত্ব অল্পসংখ্যক একটি শ্রেণীর কাঁধে চাপানো চিরকাল উচিত নয়। দেশের লোকের উচিত নিজেদের বোঝা নিজেদের বওয়া।"

সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন 'স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি দায়িত্ব হয়েছে। এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক শিক্ষিতের আয়ত্তের মধ্যে না থাকে, সেগুলি যেন দেশের লোকের সকলের কাছে পৌঁছে যায়'। তাঁর স্থির বিশ্বাস, মাতৃভাষায় মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারেই তা সম্ভব হতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জাপান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেছেন—"প্রায় ১০০ বছর হল পাশ্চাত্ত্য জাতের হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করলো যে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে, আমাদের

দেশেও সে-জ্ঞান ও সে-সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। এখনও ১০০ বছর হয় নি, এরই মধ্যে জাপানের কীর্তিকলাপের কথা সকলেই জানেন। আমি গিয়ে দেখলাম যে '৭ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হল, তখন জাপানের দুরবস্থাব শেষ ছিল না। আজকে কিন্তু জাপানে গেলে মনে হবে না যে এবকম কোন অবস্থার ভেতব দিযে তাদেব যেতে হয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এত অল্প সমযেব মধ্যে দেশেব সেই দুরবস্থা থেকে বর্তমানে অতি সম্পদেব মধ্যে কি করে তাবা দেশবাসীদের আবার তুলে ধরল ?"

স.ত্যন্দ্রনাথ বলেছেন, এটা সম্ভব হয়েছে মাতৃভাষাব মাধ্যমে জাপানে শিক্ষার বনিযাদ গড়ে তোলার ফলেই। 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্পর্কিত যে আলোচনা-চক্রে যোগদানের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ জাপানে গিয়েছিলেন, সে-সম্মেলনে তিনি ছাড়া আরো দু-একজন বিদেশী ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগই জাপানের লোক এবং সম্মেলনে যা কিছু আলোচনা হয়েছিল তা সমস্তই জাপানী ভাষাতে হয়। অবশ্য তাঁবা যে ইংবেজি জানতেন না তা নয়, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখেরা যখন ইংরেজিতে কথা বলতেন তখন তাঁবা বুঝতে পারতেন। অথচ যে-সব জাপানীবিজ্ঞানী ও দার্শনিক সেখানে ছিলেন তাঁরা সকলেই জাপানী ভাষাতে নিজের মনোভাব ব্যক্ত কবেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে বলেছেন—"দেখা গেল, শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা বর্তমান বিজ্ঞানের উচ্চ স্তরের কথা সবই জাপানী ভাষাতে সম্ভব বলা এবং জাপানী ভাষাতে সে-সব বলবার জন্যে সেখানকার লোকে ব্যগ্র।"

অথচ আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় জাপানী ভাষার কতকগুলি অসুবিধা আছে। সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হলো, জাপানী ভাষায় অক্ষরের বিপুল সংখ্যা। উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করতে হলে এ-সমস্তই শিখতে হয় এবং তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে প্রায় ৬ বছর কেটে যায়। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রত্যেক জাপানী বিজ্ঞানী, জাপানী দার্শনিক নিজের প্রত্যেকটি কথা মাতৃভাষায় প্রকাশ করে থাকেন। এরই ফলে জাপানে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে এবং এত অল্পকালের মধ্যে তাঁরা সমৃদ্ধির শীর্ষস্থানে উঠতে পেরেছেন। জাপানে এই অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসে সত্যেন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—" I have returned from Japan firmly convinced about the necessity

of adopting the language of the province as the medium of instruction in the university."

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলে থাকেন, ভারতীয় ভাষাসমূহে বিজ্ঞানচর্চার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, আগে পরিভাষা গড়ে উঠুক, তারপর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা চালু হবে—এটা কাজের কথা নয়। মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু হলেই পরিভাষা আপনা থেকে গড়ে উঠবে। তা ছাড়া টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি শব্দ আমরা যেমন হজম করে নিয়েছি, তেমনি প্রয়োজনবোধে অন্যান্য শব্দও আমাদের ভাষায় বেমালুম আত্মসাৎ করতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাষার জাত যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

খুঁটিনাটি নানা ওজর তুলে যে-সব বিজ্ঞানী বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন তাঁদের সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—"যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না।" বিজ্ঞানী যা সত্য বলে মনে করেন, পরীক্ষার দ্বারা তার যাথার্থ্য প্রদর্শন করতে চান। সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সামনে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সম্ভাব্যতা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে বিশেষ আগ্রহান্বিত—"I feel this very desirable that somewhere in our country, the experiment of running a modern university with a strong bias towards science and sociology, where the medium will be an Indian language, be launched."

সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় আমাদের কাছে আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমার যদি অর্থবল থাকত তেমন শক্তি-সামর্থ্য থাকত, তা হলে আমি নিজেই একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে দেখাতুম মাতৃভাষায় উচ্চ বিজ্ঞানশিক্ষা পর্যন্ত দেওয়া যায় কিনা এবং তার ফল কত স্বর্ণপ্রসূ হয়।"

যদিও সত্যেন্দ্রনাথের এই পরম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি, কিন্তু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি অন্তত একটি দিকে তাঁর জীবনের স্বপ্নসাধকে রূপায়িত করতে পেরেছেন। তাঁর অন্তরের কামনা—'যে সমস্ত বস্তুজ্ঞান দেশের লোকদের কাজে লাগে, তাদের নীরোগ রাখে, তাদের বিত্তশালী করে, তাদের

মুখের খাবার জুগিয়ে দেয়, সেই জ্ঞান দেশের সর্বত্র, সকলের অল্প আয়াসেই হয়'—দেশের জনমানসে সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার প্রশস্ত ও একমাত্র পন্থা হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনেই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ব্রতী এবং গত ষোল বছর যাবৎ এই উদ্দেশ্যে নানা কর্মপ্রয়াস করে আসছেন—সাধারণের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিকপত্রিকা ও সাধারণের জ্ঞাতব্য নানা বিষয়ে বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রকাশ, অবৈতনিক বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালন, লোকরঞ্জন বিজ্ঞান বক্তৃতা ও বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন। বিজ্ঞানব্রতী রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসু বিজ্ঞান পরিষদেব কর্মপ্রয়াসের সাফল্যের উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুর পুর্বে পরিষদকে ৬ হাজার টাকা দান করে যান। সেই অর্থ থেকে প্রতি বছর রাজশেখর বসু স্মারক বক্তৃতাব আয়োজন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা-প্রদানের জন্যে আহ্বান করা হয়।

বাংলাভাষায় লোকরঞ্জন বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশ বিজ্ঞান পরিষদের একটি প্রধান কর্মোদ্যোগ এবং অন্যান্য পুস্তক-প্রকাশকেরাও এ-কাজে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু বাঙালী বিজ্ঞানীরা তাঁদের মৌলিক গবেষণা-পত্র বাংলাভাষায় সাধারণত প্রকাশ করেন না। সত্যেন্দ্রনাথের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক অতুলচন্দ্র গুপ্ত একদা তাঁকে বলেছিলেন—'যেদিন দেখব বাংলাভাষায় মৌলিক গবেষণাপত্র রচিত হচ্ছে সেদিন বুঝব মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সার্থক হয়েছে'। অতুলচন্দ্রের অভীপ্সা পূর্ণ করার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন এবং কেবলমাত্র মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ দিয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। 'রাজশেখর বসু সংখ্যা'রূপে ১৯৬০ সালে এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় এবং বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাঁদের মৌলিক গবেষণার বিষয় এতে আলোচনা করেন। বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ।

কিন্তু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব গৃহ না থাকায় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কাজ রূপায়িত করা সম্ভব হয় নি এবং প্রারব্ধ কাজগুলিরও সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যাহত হয়েছে। এ-কারণে পরিষদের একটি নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা সত্যেন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্নের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। পরিষদের গৃহনির্মাণকল্পে অর্থ সংগ্রহের

জন্যে তিনি যেমন সরকারের সাহায্য চেয়েছেন, তেমনি দেশবাসীর কাছেও আবেদন জানিয়েছেন। এ-উদ্দেশ্যে তিনি ব্যক্তি-বিশেষের কাছে গেছেন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরোধ করেছেন এবং সভাপতি বা প্রধান অতিথিরূপে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে উদ্যোক্তাদের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানাতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর আবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন সাড়া দিয়েছেন, বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিবিশেষও অর্থ দান করতে এগিয়ে এসেছেন এবং বিজ্ঞান প্রসারকামী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও অর্থসাহায্য করেছেন। তবে কোনো কোনো অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা তাঁকে অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করেন নি এবং দু-একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পপ্রতিষ্ঠানও (যেখানে তিনি স্বয়ং গিয়ে অর্থসাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন) তাঁর মর্যাদা রক্ষা করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং দেশবাসীর কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থসাহায্য পাওয়া গেছে তা দিয়ে কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার (Calcutta Improvement Trust) কাছ থেকে সুবিধাজনক হারে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয়েছে। এবং সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবসের (পয়লা জানুয়ারী ১৯৬৪) পুণ্যপ্রভাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উক্ত স্থানে পরিষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরের স্বপ্নসাধ আজ সার্থক রূপায়ণের পথে।

কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে কোনো বিজ্ঞানী-গোষ্ঠী বা বৈজ্ঞানিক সংস্থা গঠন করলেন না! এটা হয়তো তাঁর জীবনের একটি ত্রুটি। কিন্তু দেশের বৃহত্তর জনসমাজকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি যা করেছেন তার মূল্যও তো কম নয়! তা-ই কি তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে না? এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মতো, স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মতো, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মহাজাতি সদনের মতো সত্যেন্দ্রনাথের বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদও তাঁর অক্ষয় কীর্তি বহন করে 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়ে থাকবে।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা ও বক্তৃতা

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন স্বল্পসংখ্যক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন, তেমনি অন্যান্য মানব-সাংস্কৃতিক বিষয়েও তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা সীমিত। এমন কি, স্বদেশেবিদেশে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি যে-সব বক্তৃতা প্রদান করেছেন তার অধিকাংশই মৌখিকভাবে প্রদত্ত—লিখিত ভাষণ নয়। এদেশে বর্তমান যুগের মনীষী ব্যক্তিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই বোধ হয় সবচেয়ে কম লিখেছেন।

বিজ্ঞানীমহলে কেউ কেউ প্রকাশিত গবেষণা-পত্রের সংখ্যাধিক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন এবং যাঁর যত বেশি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে তিনি তত আত্মশ্লাঘা বোধ করে থাকেন। কিন্তু সত্যকার গবেষণা কাজের মূল্য নির্ণীত হয় সংখ্যাধিক্যে নয়—হয় কাজের উৎকর্ষে। তাই সত্যেন্দ্রনাথ মাত্র চার পাতার একটি গবেষণাপত্র (বোস সংখ্যায়ন সংক্রান্ত) রচনা করে মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের 'একক ক্ষেত্রতত্ত্ব' সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ যদিও অত্যল্প, কিন্তু যতটুকু তিনি লিখেছেন তাতে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। বিজ্ঞানীরা স্বধর্মে ভাবাবেগবর্জিত, এ-কারণে তাঁদের রচনায় অযথা উচ্ছ্বাস বা চটকদার বাক্যবাহুল্য দেখা যায় না। যতটুকু কথা তাঁরা বলেন ওজন করেই বলেন। দ্বিতীয়ত, ধারণা যাঁর স্বচ্ছ ও অনুভূতি যাঁর গভীর, তাঁর বক্তব্য সহজ প্রাঞ্জল হবেই। সত্যেন্দ্রনাথ রচিত গবেষণাপত্রে এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিক আলোচনাতে এ দুটি প্রসাদগুণই দেখা যায়।

১৯৪৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনে মূল-সভাপতিরূপে সত্যেন্দ্রনাথ প্রদত্ত 'The Classical determinism and the Quantum theory' সম্পর্কে লিখিত ভাষণটি তাঁর এই রচনাবৈশিষ্ট্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন…"If we set our

experiments in such a fashion as to determine accurately the space-time co-ordinates, the same arrangement cannot be simultaneously used to calculate the energy momentum relations accurately ; when our arrangements have pushed the accuracy of determining the positional co-ordinates to its utmost limit, the result evidently will be capable only of a corpuscular representation. If on the other hand, our aim is to determine momentum and energy with the utmost accuracy, the necessary apparatus will not allow us any determination of positional co-ordinates and the results we obtain can be understood only in terms of the imagery of wave-motion. The apparently contradictory nature of our conclusions is to be explained by the fact, that every measurement has an individual character of its own. The quantum theory does not allow us to separate rigorously the contribution of the object and the instrument and as such the sum total of our knowledge gained in individual cases cannot be synthesised to give a consistent picture of the object of our study which enables us to predict with certainty its behaviour in any particular situation. We are thus doomed to have only statistical laws for these elementary particles and any further development is not likely to affect those general conclusions."

বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ আলোচনাতেও সত্যেন্দ্রনাথের এই রচনাবৈশিষ্ট্যের সৌকর্য দেখা যায়—

"All descriptions of physical phenomena would require a frame of reference fixed relative to the observer who notes where the events happen ; he has also to note when they occur for which he has to evolve his own way of measuring time. In his fundamental laws of motion, Newton had admitted the eqvivalence of frames, moving relative to one another with constant relative velocities. This motion apparently had no effect on the ultimate explanation

of natural phenomena, in terms of his dynamical laws. Time, however, occupied a special position in his system Ideal clocks which served to mark time for the different observers moving relatively to one another, would, according to him, all go at the same rate and thus provide a unique canvas against which all observers could note their observations Einstein showed this concept of time to be an untenable hypothesis The invariant quantity should not be time, but the velocity of light signals which helped each observer to set up his time-standard everywhere in the space-frame in which he happened to be at rest This simple hypothesis led at once to the famous transformation-laws of space and time co ordinates". (Albert Einstein Science and Culture, May 1955)

সত্যেন্দ্রনাথের নিপুণ ইংরেজি রচনা যখন এত সহজ ও প্রাঞ্জল, তখন তাঁর বাংলাভাষার রচনা যে আরও প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হবে তা সহজেই অনুমেয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বাংলা-সাহিত্যের গভীর অনুরাগী এবং সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী। ছাত্রকালেই তাঁর বাংলাভাষায় যথেষ্ট দখল ছিল এবং পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। প্রমথ চৌধুরী বাংলা-সাহিত্যে যে চলিত ভাষারীতি প্রচলন করেন তা সত্যেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁর নিজস্ব বাংলা রচনায় প্রমথ চৌধুরীর এই রীতির প্রভূত প্রভাব দেখা যায়।

চলিত ভাষার প্রসাদগুণে এবং বক্তব্যের স্বচ্ছতায় জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনাও যে কত প্রাঞ্জল হতে পারে তা সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত বাংলা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বিজ্ঞানের সংকট' (পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৮) পড়লে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। নিদর্শনস্বরূপ এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি।—

"ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতি ক্ষুদ্র ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরো ছোট প্রোটন বা ইলেকট্রনের আয়তন ও

আকৃতিও আমরা সেইরূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডগুলির আকৃতি এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশি যে, জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থরিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে আলোককে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গবিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্ত্রের অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথার নামে একটা বিচ্ছেদহীন অখণ্ড পদার্থ। পরমাণু বা বিদ্যুৎকণা সেই ঈথার-সমুদ্রে ভাসমান। আলোকরশ্মি এই ঈথার-সমুদ্রের তরঙ্গবিশেষ। এই সমুদ্রে ছোটবড় নানারকমের ঢেউ উঠতে পারে এবং সকল ঢেউ রিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান। আলোর বর্ণভেদের কারণ ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যে সকল ঢেউ-এর স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তাদের চেয়েও অনেক বড় ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। ঈথারে তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশপথে যে বেতারে নিমেষের মধ্যে একস্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কার্যে বার্তাবহ ঈথারের ঢেউ। এগুলি আলোক ঢেউ-এর চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে রঞ্জনরশ্মি আজকাল রোগ-নিদানের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলিও ওই ঈথারের তরঙ্গমাত্র, তবে সেগুলি আলোর ঢেউ-এর তুলনায় অনেক ছোট।"

আর একটি উদাহরণ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মতো জটিল তত্ত্বও কত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন—"এইসময় (১৯০৫) আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পেটেন্ট অফিসে কাজ করেন পেটের দায়ে, গবেষক হিসাবে তখন সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত-কুলশীল—এখান থেকেই সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কথা তিনি বিজ্ঞানজগতে প্রচার করেন। বিরোধের কারণ দেখালেন, বিশেষ করে নিউটনীয় গণিতে কালের

পরিকল্পনায়। দর্শকের গতিনিরপেক্ষ এই কাল যে বৈজ্ঞানিক জগতে অচল— এটিই আপেক্ষিকতাবাদেব মূল কথা। প্রতি দর্শককেই তাব জগতের মাপজোখের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মধ্যে কার্যকারণের শৃঙ্খলা খুঁজতে গেলে—কোথায় ঘটেছে কোন্ বিশেষ ঘটনা এবং কখন সেটি ঘটলো— এই দু-এরই খবর রাখতে হয। ব্যবধানের হিসাব হয় মাপকাঠির গুণে ও ও ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মূল সূত্রগুলি অনুসাবে এবং সময়েরও মাপ করতে হবে ঘড়ির কল্পনা করে। প্রথম থেকে ধরে নিলে চলবে না যে এই মাপ-জোখের কাল একই এবং দর্শকের গতিনিবপেক্ষ, ববং বুঝতে হবে যে কালেব পরিমাপের সম্ভাবনাব মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে যে মূল নীতি সেটিই হচ্ছে আলোকের দর্শকনিরপেক্ষ অপরিবর্তিত বেগ। মাত্র এরই আশ্রযে প্রতি দর্শকের যে নিজস্ব কালের পবিকল্পনা সম্ভব তা আমবা অবিসম্বাদীরূপে দেখাতে পারি। পবিমিত কালেব এই কল্পনাব সঙ্গে নিউটনীয় গণিতের সাক্ষাৎ বিবোধ আছে। আইনষ্টাইনের অনুসরণে দেশ ও কালের পবিমাপেব মধ্যে দর্শকেব নিজের গতির প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে থাকে তা সকল বিজ্ঞানী স্বীকাব কবেন। প্রকৃতিব নিয়মাবলীব মূল সূত্র যে এইভাবে শুদ্ধ চিন্তাপথে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব, আইনষ্টাইনের আবিষ্কার তাব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত' (আইনষ্টাইন : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল ১৯৫৫)।

বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যাদের মোটামুটি ধাবণা আছে তারা সকলেই জটিল বৈজ্ঞানিক বিষযেব এইবকম প্রাঞ্জল আলোচনা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা শুধু যে প্রকাশভঙ্গীতে সহজ প্রাঞ্জলতা নয়, তাঁর লেখার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যিক মুন্সিয়ানার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এরই কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করছি—"সূর্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে তেজ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ, আলো। সেই তেজ, আলো, উত্তাপের সাহায্যে প্রাণ গডছে অদ্ভুত জীবজগৎ। অচেতন বস্তুর জডতাকে দূর করে চেতনের কায়বস্তু গডতে দরকার বিপুল কার্যসম্ভারের, তারও চাহিদা যোগায় সূর্যের এই তেজ। এই বিপুল কার্যক্ষমতার সার কি করে বস্তুর মধ্যে বদ্ধ হলো, কি কৌশলেই আবার তাকে নিজের কাজে লাগানো যাবে, সব সময় এই কথা

ভাবছে মানুষ। যে অবস্থা, যে পরিবেশের মধ্যে সে জন্মেছে, মানুষ তাকে নিত্যধ্রুব বলে মানে না। সে চায় মনের মত জগৎ গড়তে, যার মধ্যে তার প্রাণের প্রেরণা অবাধ স্ফূর্তি লাভ করতে পারবে। জগতের সৃষ্টির খেলার মূল সূত্রগুলি তাই সে খুঁজছে। বস্তুর মধ্যে লুকানো শক্তির ভাণ্ডারের চাবিকাঠি তাই তার নিতান্ত দরকার। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে তার এই সাধনার কথা, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে এই সংগ্রামের বর্ণনা লেখা রয়েছে।…মানুষ যতই সভ্যতার ধাপে উঠছে, যতই সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি হচ্ছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে জমানো তহবিল থেকে খরচের হার। পৃথিবী প্রতিদিন যা সূর্যের কাছে পাচ্ছে, তারই পরিমিত ব্যয়ে তার সংসার আর চলে না। বর্তমান সভ্যতার চাহিদা মিটানো শক্ত, তবু সে মোহিনী তাকে মুগ্ধ করেছে। কল্পনার কুহকে নিজের খেয়ালে সে পূর্ব যুগের তহবিল নিঃশেষ করতে চলেছে।…জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত হয়েও পাকা জুয়াড়ীর চৈতন্য হয় না। সে ফেরে নতুন বিত্তের সন্ধানে, যা পণ রেখে আবার সেই সর্বনেশে জুয়ায় নিজের ভাগ্যপরীক্ষা নতুন করে করতে পারবে। মানুষের প্রকৃতি কতকটা এই জাতীয়" (শক্তির সন্ধানে মানুষ : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ১৯৪৮)।

এই লেখা পড়ে কি মনে হবে এটি নীরস বিজ্ঞান আলোচনা? মনে হবে যেন কোনো দক্ষ সাহিত্যিকের রসোত্তীর্ণ রম্য রচনা পড়ছি। সত্যেন্দ্রনাথের রচনা থেকে এমনি আরও বহু নিদর্শন দেওয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনার মতো তাঁর বক্তৃতায় বা ভাষণেও ভাষা বা বক্তব্যের কোনো জটিলতা থাকে না এবং তাতে পাণ্ডিত্য জাহিরিপনাও প্রকাশ পায় না। যা তিনি বলতে চান তা সহজ সরলভাবেই ব্যক্ত করেন। সাধারণত ঘরোয়া পরিবেশ বা বৈঠকী ঢঙেই তিনি বক্তৃতা করে থাকেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার মধ্যে মননশীলতা ও আত্মোপলব্ধির সুর সব সময় ফুটে ওঠে। এ-কারণে তাঁর বক্তৃতা শ্রোতার হৃদয়কে স্বভাবতই স্পর্শ করে।

সত্যেন্দ্রনাথের বক্তৃতার এই বৈশিষ্ট্যের আভাস দিতে দুটি বক্তৃতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি। জাপানের টোকিও শহরে আয়োজিত 'বিজ্ঞান ও মানব-সমাজে তার স্থান' সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন—"…we orientalists are reputed to have a sort of different way of getting knowledge, a sort

of intuitive knowledge and if you want to understand how the tree grows, you try to think yourself at once with tree, and then once having brought yourself in tune with a particular phenomenon, you will perhaps be better able to understand it than when you simply observe it outside. I suppose in some biological sciences you still try to explain the behaviour of the cells in a similar way, bringing down to this elemental plane the ideas of human relationships with which we are familiar attraction, desire, and volition etc. All these things come in But while it remains always something personal with the scientist, his results are always expressed in terms of measured quantities similar to those of natural scientists' একেবারে সাদাসিধা সহজ ভাষায় এই কথাগুলি বলা হয়েছে, কিন্তু কত চিন্তাপূর্ণ ও অর্থব্যঞ্জক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতায় এই সুরেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এদেশে সব কিছুর মধ্যে একটা সনাতনী মনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি এই বক্তৃতার অংশবিশেষে বলেছিলেন—"একবার পরিহাসচ্ছলে আমাদের দেশের এক নেতা বলেছিলেন আর একজন বিশেষ কোনো নেতার বিষয়ে যিনি সনাতনী। বলেছিলেন, 'লোকটি এমন সোজা ছুরি যদি তার মধ্যে চালিয়ে দাও তাহলে সেটা কর্ক-স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে'। আমাদের দেশের লোকের মনোভাব হয়তো এই ধরনের। খুব সোজা সরল সত্য কথা বললে সেটা অনেক সময় কাব্য হয়ে বেরিয়ে আসবে। অদ্ভুত মনোভাব। এইটে আমার বার বার মনে হয় যে আমাদের কথাও যেমন, চলনেও তেমনি এবং বিজ্ঞানও প্রায় তাই। যে মনোভাব বলিষ্ঠ, যাকে বলে 'কোদালকে কোদাল বলা'—সেটা যেন আমাদের মনেতে বিশেষ নেই। আমাদের সবই কাব্য। কাব্যমধু খেয়ে আমরা একেবারে এমন মাতোয়ারা হয়ে আছি যে চোখের সামনে আর কিছু দেখি না।"

সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশেবিদেশে বহুস্থানে নানা উপলক্ষে নানা বক্তৃতা দিয়েছেন এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদিও কিছু কিছু লিখেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর

রচিত কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহুপূর্বে প্রকাশিত ডঃ মেঘনাদ সাহার সহযোগিতায় আইনষ্টাইন ও মিনকওস্কি-র আপেক্ষিকতাবাদের ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ ছাড়া)। এ-সম্পর্কে কেউ কেউ অনুযোগও করে থাকেন—সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্যে দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছেন, কিন্তু তিনি নিজে বাংলাভাষায় একটি বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করলে ভালো হত। বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ নিজে লেখনী ধারণ করলে একটি আদর্শ গ্রন্থ রচিত হত নিঃসন্দেহে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ লেখায় বিশেষ প্রেরণালাভ করতেন। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, যাঁরা চিন্তারাজ্যে নিয়ত আত্মমগ্ন তাঁদের দিয়ে ফরমাশমাফিক কোনো কাজ করানো যায় না। তাঁরা স্বয়ং যদি প্রেরণা বোধ করেন, তবেই একটা মহৎ সৃষ্টি হতে পারে।

দেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

যাঁদের পরিচয়ে দেশের পরিচয়, যাঁদের গৌরবে দেশের গৌরব, যাঁদের মনীষায় দেশের মনীষার স্বাক্ষর—দেশে দেশে যুগে যুগে তাঁদের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এবং যখন তাঁদের জীবনের কোনো বিশেষ উপলক্ষ আসে, তখন স্বভাবতই শ্রদ্ধানিবেদনের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবেই জেগে ওঠে। মনীষীদের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উৎসব এমনি এক পরম আকাঙ্ক্ষিত উপলক্ষ। জাতির জীবনে এমন উপলক্ষ সচরাচর ঘটে না। তাই যখন এমন বিরল উপলক্ষ উপস্থিত হয় তখন দেশবাসীর আনন্দের সীমা থাকে না। ইতিপূর্বে এমন আনন্দময় উপলক্ষের দুর্লভ সুযোগ আমরা পেয়েছিলুম আচার্য জগদীশচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের মহাজীবনে। আর ১৯৬৪-র পয়লা জানুয়ারীর শুভ দিনটিতে এমনি আর এক দুর্লভ সুযোগ আমরা পেয়েছিলুম বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে।

বিজ্ঞানী হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান-জগৎকে যা দিয়েছেন এবং মানুষ হিসাবে তাঁর কাছ থেকে দেশ যা পেয়েছে, তার স্মরণে ও গৌরবে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী একটি আনন্দ-মহোৎসবের মধ্য দিয়ে সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত মহাজাতি সদনে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিন ঋষিকল্প এই প্রাজ্ঞ মানুষটিকে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন—তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন আচার্য বসুর ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও বন্ধুগণ, তেমনি ছিলেন দেশের সাধারণ মানুষ যাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা ও হৃদয়বত্তার কথা শুধু পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন বা লোকপরম্পরায় শুনেছেন। সেদিন মহাজাতি সদন যেন পরিণত হয়েছিল এক মহাতীর্থে—যেখানে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সন্দর্শনে সমবেত সকলে। সুপ্রশস্ত মহাজাতি সদনে সেদিন তিল ধারণের স্থান ছিল না—সদনের বাইরেও ছিল আগ্রহাকুল অগণিত জনতা।

সত্যেন্দ্রনাথকে সেদিন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শুধু এদেশের রাষ্ট্রপতি,

উপ-রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নয়; তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন অধ্যাপক হাইসেনবার্গ, অধ্যাপক বার্নল, অধ্যাপক মার্ক, অধ্যাপক ইয়ামানুচি প্রমুখ বিশ্বের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞান-সংস্থাও। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বসুকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, ডঃ দেবেন্দ্র-মোহন বসু, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী বি মালিক, শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব এবং জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। দেশবাসী তাঁর হস্তে অর্পণ করেছিলেন অর্ঘ্য ও অভিনন্দন-পত্র এবং তাঁর সহধর্মিণীকে প্রদান করেছিলেন শ্রদ্ধা-উপহার।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে দেশবাসী সেদিন বলেছিলেন—

আচার্যদেব,

সুদীর্ঘকাল পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ গবেষণায় সাফল্য লাভ করে জগতের বিজ্ঞানসাধনাকে তুমি বিশেষভাবে সম্পদশালী করেছ। যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় আজ ভারত বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তুমি তাঁদেরই অন্যতম। বিজ্ঞান-ভারতীর আরতিশালায় তোমারই হস্তের প্রদীপ অনির্বাণ শিখায় আজ প্রদীপ্ত। আমরা তোমার স্বদেশবাসী, ছাত্রবৃন্দ, সহকর্মী ও বন্ধুবর্গ—আমাদের গৌরবের অবধি নেই। আজ তোমার সপ্ততিবর্ষ পূর্তিতে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভ কামনা জানাই।

হে তপস্বি,

পদার্থবিদ্যার ও গণিত শাস্ত্রের নব-রূপায়ণ তোমার সাধনায়। মহাবিজ্ঞানী ডিরাক একশ্রেণীর মৌলিক কণার যে 'বোসন' নামকরণ করেছেন, তা তোমারই অক্ষয় কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে। হে কর্মবীর, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চায় তুমি উদ্বুদ্ধ করেছ দেশবাসীকে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা তোমারই মহৎ কীর্তি।

হে বিশ্ববরেণ্য,

বাংলার সুযোগ্য সন্তান তুমি। কিন্তু তোমার যশ শুধুমাত্র বাংলা বা ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে আজ পরিব্যাপ্ত। স্বদেশের জাতীয় সরকার তোমাকে

শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক-পদে বরণ করে নিয়েছে, আর তোমার প্রতিভামুগ্ধ বিদেশী বিজ্ঞান-সমাজ তোমাকে রয়েল সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্যরূপে গ্রহণ করেছে। একদিকে তোমার নামের সঙ্গে বিশ্ববিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের নাম সসম্মানে যুক্ত, অপরদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জয়তিলক তোমার ললাটে। তোমার বিপুল কীর্তি দেশবিদেশে আজ সুবিদিত।

হে সত্যপূজারি,

বিদ্যার আরাধনায় তুমি উৎসর্গ করেছ তোমার সমগ্র সত্তাকে। সে-পূজার শুভ্র জ্যোতি দিক্‌দিগন্তরে বিচ্ছুরিত। শিশুসুলভ সারল্য ও মধুময় হাসির সহিত কঠোর সত্যনিষ্ঠা তোমার মানবতাকে মহিমান্বিত করেছে। তোমার গভীর মানবপ্রীতি ও চরিত্রমাধুর্যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্বদেশের পার্থিব সমৃদ্ধির প্রসার প্রচেষ্টায় মূর্ত হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলিত সত্তা। হে বন্ধু, দুঃখের দিনে তোমায় কাছে পেয়েছি সমবেদনা, সুখের দিনে পেয়েছি তোমার আনন্দের সাহচর্য।

হে সর্বজনপ্রিয়,

তুমি আমাদের হয়েও সবাকার, ভারতের হয়েও বিশ্বের, তোমার কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করি। হে গুরু, তোমার আলোকবর্তিকা আমাদের পথ প্রদর্শন করুক, তোমার মানবতা আমাদের অন্তর উদ্বুদ্ধ করুক। তুমি আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

দেশবাসীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইলো তাঁর স্নেহধন্য এক নগণ্য শিষ্যেরও শ্রদ্ধার্ঘ্য—

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে।

———

পরিশিষ্ট (ক)

১ জানুয়ারী ১৮৯৪ : উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ঈশ্বর মিল লেনের পৈতৃক গৃহে জন্ম।

১৯০৯ : হিন্দু স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার।

১৯১১ : প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান গ্রহণ।

১৯১৩ : প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে গণিত অনার্স-এ শীর্ষস্থান অধিকার।

১৯১৪ : কম্বুলিয়াটোলা-নিবাসী ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র সন্তান শ্রীমতী উষাবতী দেবীর সহিত বিবাহ।

১৯১৫ : এম এস-সি পরীক্ষায় মিশ্র গণিতে প্রথম স্থান অধিকার।

১৯১৭ : স্যার আশুতোষের আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা ও মিশ্র গণিতের লেকচারার-রূপে যোগদান।

১৯২১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রীডার-রূপে যোগদান।

১৯২৪ : 'বোস সংখ্যায়ন' সংক্রান্ত বিশ্বখ্যাত গবেষণাপত্র রচনা এবং স্বয়ং আইনষ্টাইন কর্তৃক অনুদিত হয়ে বিশিষ্ট জার্মান পত্রিকা 'Zeitschrift fur Physik'-এ সেটি প্রকাশিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্য লাভ করে ইউরোপ গমন। প্রথমে ফ্রান্সে গমন এবং সেখানে মাদাম কুরী এবং দ ব্রোয়ীর গবেষণাগারে কিছুকাল গবেষণা।

১৯২৫ : জার্মানীতে গমন এবং বার্লিনে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা, পদার্থবিদ্যার সাপ্তাহিক সেমিনারে যোগদান।

১৯২৬ : জার্মানী থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৭ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান ; বিজ্ঞান বিভাগের ডীন।

১৯২৯ : মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে পদার্থবিদ্যা ও গণিত শাখার সভাপতি।

১৯৩৭ : রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন।

১৯৪৪ : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১ তম অধিবেশনে মূল সভাপতি-পদে বৃত।

১৯৪৫ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক-পদে যোগদান।

১৯৪৮ : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯৪৮-৫০ : ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর সভাপতি।

১৯৫১ : UNESCO-র আহ্বানে আন্তর্জাতিক পরিগণন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনার জন্যে ভারতের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে প্যারিসে গমন ; পরে ইংলণ্ড ও জার্মানী ভ্রমণ।

১৯৫২-৫৮ : রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য।

১৯৫২ : কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি।

১৯৫৩ : বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের আমন্ত্রণক্রমে বুদাপেস্টে গমন ; প্যারিস, কোপেনহাগেন, জুরিখ, প্রাগ ও মস্কো ভ্রমণ।

১৯৫৪ : প্যারিসে আন্তর্জাতিক ক্রিস্ট্যালোগ্রাফী সম্মেলনে যোগদান।

ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত।

১৯৫৫ : ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংসদের আমন্ত্রণক্রমে প্যারিসে গমন। জুলাই মাসে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন

শহরে আয়োজিত 'আপেক্ষিকতাবাদের ৫০ বছর' পূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান।

১৯৫৬ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক-পদ থেকে অবসর গ্রহণ ; বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে যোগদান। ব্রিটিশ বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির আহ্বানে লণ্ডন গমন।

১৯৫৭ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। এলাহাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান।

পরিশিষ্ট (খ)

গবেষণাপত্র ও রচনাবলী

গবেষণাপত্র :

1. (With M. N. Saha)—A new equation of state in stresses in medium : Philosophical Magazine, 36, 1918.
2. Energy spectrum of an atomic model : Phil. Mag, 40, 1920.
3. Plancks Gesetzund Lichtquanten Hypothese : Zeits. f. Physik. Bd 26, 1924.
4. Warmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenhiet von Matrie : Zeits. f. Physik. Bd 27, 1924.
5. On the complete moment-coefficients of the D^2-statistics : Sankhya. The Indian Journal of Statistics. Vol 2, Part 4, 1936.
6. On the total reflection of electromagnetic waves in the ionosphere : Indian Journal of Physics. Vol XII. Part 2, 1938.
7. Studies in Lorentz group : Bulletin of the Calcutta Mathematical Society. Vol 31, 1939.
8. (With S. C. Kar)—The complete solution of the equation $\Delta^2\varphi - \frac{\delta^2\varphi^2}{c^2\delta t^2} - k^2\varphi = -4\pi\varrho(x, y, z)$.

   Proc. Nat. Inst. Sciences, India. Vol 17, 1941.
9. On an integral equation associated with the equation for hydrogen atom : Bull. Cal. Math. Soc. Vol 37, 1945.
10. (With R. K. Dutta)—Extraction of Germanium from Sphalerite collected from Nepal : Journal of Scientific and Industrial Research. Vol 9 B, No 11, 1950.

11 Les identites de divergence dans la nouvelle theorie unitaire Comptes Rendus des Seances de *l'* Academie des Sciences (Paris). *t* 236, 1953

12 Une theorie du champ unitaire avec $\Gamma_\mu \neq 0$
Le Journal de Physique et le Radium *t*. 14, 1953

13 Certaines consequences de *l'* existence du tenseur *g* dans le champ affine relativiste Le Journal de Physique et le Radium. *t* 14, 1953

14 The affine connection in Einstein's new unitary field theory Annals of Mathematics Vol 59, 1954.

(অধ্যাপক বসুর প্রধান গবেষণাপত্রগুলি এখানে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া, তাঁর আরও কয়েকটি মূল্যবান গবেষণাপত্র আছে।)

ইংরেজি রচনাবলী :

1. The Principle of Relativity (Original Papers by A. Einstein and H Minkowskei) Translated into English by M N Saha and S N. Bose With a historical introduction by Prof P C. Mahalanobis Published by the University of Calcutta, 1920.
2. Tendencies in the Modern Theoretical Physics : Sectional President's Address Indian Science Congress Madras, 1929
3. Recent Progress in Nuclear Physics Science and Culture. Vol 2, April 1937.
4. The Classical Determinism and the Quantum Theory : General President's Address. 31st Indian Science Congress Delhi, 1944
5. Search for new sources of power . 16th Acharya J. C. Bose Memorial Lecture, Bose Institute. 1954.

বাংলা রচনাবলী

১। বিজ্ঞানের সংকট : পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৮।

২। আইনস্টাইন : পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪২।

৩। রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের কথোপকথনের বঙ্গানুবাদ : বিজ্ঞান-পরিচয়, সেপ্টেম্বর ১৯৬১।

৪। শক্তির সন্ধানে মানুষ : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ১৯৬৮।

৫। শিশু ও বিজ্ঞান : কিশোর বাংলা, কার্তিক ১৩৫৭।

৬। আইনস্টাইন : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল ১৯৫৫।

৭। প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩।

৮। (আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি) শ্রদ্ধাঞ্জলি : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, নভেম্বর ১৯৫৮।